POSTAL REG NO GDP- 43 / 2023--2025

আল্লাহ্‌র বাণী

هُوَ الَّذِيْٓ اَرْسَلَ رَسُوْلَهٗ بِالْهُدٰى وَدِيْنِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهٗ عَلَى الدِّيْنِ كُلِّهٖ ۙ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُوْنَ

"তিনিই তাঁর রসূলকে হিদায়াত ও সত্য ধর্মসহ প্রেরণ করেছেন, যাতে তিনি একে সকল ধর্মের উপর জয়যুক্ত করেন; মুশরিকরা তা যতই অপছন্দ করুক না কেন।"

(সূরা তওবা, আয়াত: ৩৩)

بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى عبده المسيح الموعود

وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ بِبَدْرٍ وَّاَنْتُمْ اَذِلَّةٌ

খণ্ড 11

বদর

সাপ্তাহিক কাদিয়ান

Weekly BADAR Qadian Bangla

সংখ্যা 6-7

সম্পাদক: তাহের আহমদ মুনির

সহ-সম্পাদক: মির্যা সফিউল আলাম

www.akhbarbadarqadian.in

বৃহস্পতিবার 5-12 ফেব্রুয়ারী- 2026 16-23 শাআবান 1447 A.H

আহমদীয়া সংবাদ

সৈয়্যদনা হযরত আমীরুল মোমিনীন খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আইঃ) আল্লাহ্‌র কৃপায় কুশলে আছেন। আলহামদো লিল্লাহ। জামাতের সদস্যদের নিকট হুযূর আনোয়ারের সুসাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু এবং হুযুরের যাবতীয় উদ্দেশ্যাবলী পূর্ণ হওয়ার জন্য ও তাঁর সুরক্ষার জন্য দোয়ার আবেদন রইল। আল্লাহ তা'লা সর্বদা হুযুরের রক্ষক ও সাহায্যকারী হউক। আমীন।

মহানবী (সা.)-এর বাণী

ঈসা ইবন মারইয়াম (আলাইহিস সালাম) পৃথিবীতে অবতরণ করবেন। তিনি বিবাহ করবেন এবং তাঁর সন্তানসন্ততি হবে।

عَنْ عبد الله بن عَمْرو قال: قال رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَنْزِلُ عِيسَى بنُ مَرْيَمَ إِلَى الْأَرْضِ فَيَتَزَوَّجُ وَيُولَدُ لَهُ وَيَمْكُثُ خَمْسًا وَأَرْبَعِينَ سَنَةً ثُمَّ يَمُوتُ فَيُدْفَنُ مَعِي فِي قَبْرِي فَأَقُومُ أَنَا وَعِيسَى بن مَرْيَمَ فِي قَبْرٍ وَاحِدٍ بَيْنَ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ

(مشكاة المصابيح كتاب الفتن باب نزول عيسى عليه السلام الفصل الثالث)

"ঈসা ইবন মারইয়াম (আলাইহিস সালাম) পৃথিবীতে অবতরণ করবেন। তিনি বিবাহ করবেন এবং তাঁর সন্তানসন্ততি হবে। তিনি পঁয়তাল্লিশ বছর জীবিত থাকবেন, তারপর ইন্তেকাল করবেন। তাঁকে আমার কবরের নিকট, আমার পাশেই দাফন করা হবে। আমি এবং ঈসা ইবন মারইয়াম এক কবর থেকেই পুনরুত্থিত হব, আবু বকর ও উমরের মাঝখান থেকে।"

হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) সম্পর্কিত মহান ভবিষ্যদ্বাণী

হযরত মসীহ মওউদ (আ.) বলেন:

পরম করুণাময়, পরম দাতা, মহা মহিমান্বিত খোদা, যিনি সর্বশক্তিমান (জাল্লা শানুহু ওয়া আয্যা ইসমুহু) যাঁর মর্যাদা মহা গৌরবময় এবং নাম অতি মহান, নিজ ইলহাম দ্বারা সম্বোধনপূর্বক বলেন:

আমি তোমাকে 'করুণার এক নিদর্শন' দিচ্ছি তুমি যেভাবে তা আমার কাছে চেয়েছো। আমি তোমার সকরুন নিবেদন শুনেছি এবং তোমার দোয়াসমূহকে করুণার সাথে কবুল করেছি এবং তোমার সফরকে (হুশিয়ারপুর ও লুধিয়ানার) তোমার জন্য কল্যাণময় করেছি। সুতরাং শক্তি, দয়া এবং নৈকট্যের নিদর্শন তোমাকে দেয়া হচ্ছে। ফযল এবং অনুগ্রহের নিদর্শন তোমায় দান করা হচ্ছে। আর বিজয় ও সফলতার চাবি তুমি প্রাপ্ত হয়েছো। হে মুযাফ্ফর (বিজয়ী)! তোমার প্রতি সালাম। খোদা বলেছেন, যারা জীবন প্রত্যাশী তারা যেন মৃত্যুর কবল হতে মুক্তি লাভ করে এবং যারা কবরে প্রোথিত তারা বের হয়ে আসে, যাতে ইসলাম ধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব এবং আল্লাহ্ তা'লার কালামের মর্যাদা লোকের কাছে সুপ্রকাশিত হয় এবং সত্য এর যাবতীয় আশিসসহ উপস্থিত হয় এবং মিথ্যা এর যাবতীয় অকল্যাণসহ পলায়ন করে। আর মানুষ উপলব্ধি করে যে আমি সর্ব শক্তিমান-যা ইচ্ছা করি, করে থাকি এবং যেন তাদেরও প্রতীতী হয়, আমি তোমার সঙ্গে আছি এবং যারা খোদার অস্তিত্বে অস্বীকার করে এবং খোদা ও খোদার ধর্ম, তাঁর গ্রন্থ এবং তাঁর পবিত্র রসূল মুহাম্মদ মুস্তফা (সা.)-কে অস্বীকার করে এবং অসত্য মনে করে থাকে, তারা যেন একটি প্রকাশ্য নিদর্শন প্রাপ্ত হয় এবং অপরাধীদের শাস্তির পথ পরিষ্কার হয়। সুতরাং তুমি সুসংবাদ গ্রহণ কর, এক সুদর্শন এবং পবিত্র পুত্র সন্তান তোমাকে দেওয়া হবে। এক মেধাবী পুত্র তুমি লাভ করবে। সেই পুত্র তোমারই ঔরসজাত তোমারই সন্তান হবে। সুশ্রী, পবিত্র পুত্র তোমার মেহমান আসছে। তার নাম আনমুয়ায়েল এবং বশীর বটে। তাকে পবিত্রাত্মা দেওয়া হয়েছে এবং তিনি নোংরামী থেকে মুক্ত। তিনি আল্লাহ্‌র নূর, তা আশিসপূর্ণ যা আকাশ থেকে আগমন করে। তার সাথে 'ফযল' (বিশেষ কৃপা) আছে, যা তার আগমনের সাথে উপস্থিত হবে। সে জাঁকজমক, ঐশ্বর্য ও গৌরবের অধিকারী হবে। সে পৃথিবীতে আসবে এবং তার 'সঞ্জীবনী শক্তি' এবং 'পবিত্র আত্মার' প্রসাদে বহু জনকে ব্যাধি মুক্ত করবে। সে কলেমাতুল্লাহ্-আল্লাহ্‌র বাণী। কারণ খোদার দয়া ও সূক্ষ্ম মর্যাদাবোধ তাকে সম্মানিত বাক্য দ্বারা প্রেরণ করেছেন। সে অত্যন্ত ধীমান, প্রজ্ঞাশীল, হৃদয়বান এবং গাম্ভীর্যশীল হবে। জাগতিক ও আধ্যাত্মিক জ্ঞানে তাকে পরিপূর্ণ করা হবে। সে তিনকে চার করবে (এর অর্থ বুঝিনি)। সোমবার শুভ সোমবার। সম্মানিত প্রিয় পুত্র।

مَظْهَرُ الْاَوَّلِ وَالْاٰخِرِ - مَظْهَرُ الْحَقِّ وَالْعَلَاءِ كَاَنَّ اللّٰهَ نَزَلَ مِنَ السَّمَاءِ (মাযহারুল আওয়ালে ওয়াল আখেরে মাযহারুল হাক্কে ওয়াল উলা কা আন্নাল্লাহা নাযালা মিনাস্ সামায়ে) (অর্থাৎ প্রথম এবং শেষ বিকাশ, সত্যের বিকাশস্থল ও সুউচ্চ যেন আল্লাহ্ আকাশ হতে অবতীর্ণ হয়েছে)। তার আগমন অশেষ কল্যাণময় হবে এবং ঐশী গৌরব ও প্রতাপ প্রকাশের কারণ হবে। জ্যোতি আসছে, জ্যোতি। খোদা তাকে তাঁর সন্তুষ্টির সৌরভ নির্যাস দ্বারা সিক্ত করেছেন। আমরা তার মধ্যে আপন রূহ ফুৎকার করব এবং খোদার ছায়া তার শিরে থাকবে। সে দ্রুত বড় হবে এবং বন্দীদের মুক্তির কারণ হবে। আর পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে খ্যাতি লাভ করবে। জাতিসমূহ তার কাছ থেকে আশিস লাভ করবে। তখন তার আত্মিক কেন্দ্র আকাশের দিকে উত্তোলিত হবে, ওয়া কানা আমরাম্মাকৃযিয়া (অর্থাৎ এটিই আল্লাহ্‌র অটল মীমাংসা)।

(ইশতেহার, ২০শে ফেব্রুয়ারী, ১৮৮৬ ইং)

প্রিন্টার ও পাবলিশার জামিল আহমেদ নাসের ফজলে উমর প্রিন্টিং প্রেস কাদিয়ান থেকে মুদ্রণ করে আখবার বদর কাদিয়ান অফিস থেকে প্রকাশ করছে: প্রো: তত্বাবধায়ক, বদর বোর্ড কাদিয়ান

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ

তাঁর খ্যাতি পৃথিবীর প্রান্তসীমা পর্যন্ত পৌঁছাবে; এবং জাতিসমূহ তাঁর দ্বারা কল্যাণ লাভ করবে।

হযরত মির্জা গোলাম আহমদ কাদিয়ানি (আলাইহিস সালাম)-যাঁর অন্তরে আল্লাহ তাআলা তাঁর যৌবনের একেবারে সূচনালগ্ন থেকেই ইসলাম সেবার গভীর অনুরাগ এবং রসুলুল্লাহ (সা.)-এর প্রতি অকৃত্রিম ভালোবাসা সঞ্চার করে দিয়েছিলেন-এমন এক যুগে আবির্ভূত হন, যখন অন্যান্য ধর্মের বিরুদ্ধবাদীদের পক্ষ থেকে বহুমুখী আক্রমণে ইসলাম জর্জরিত হচ্ছিল। মুসলমানরা এসব আক্রমণের জবাব দিতে অক্ষম হয়ে পড়েছিল; বরং বহু শিক্ষিত মুসলমান ব্রিটিশ সরকারের প্রভাব ও ভীতির কারণে ইসলামকেই পরিত্যাগ করছিল। এমন ভয়াবহ ও হতাশাজনক সময়ে তিনি আল্লাহর নির্দেশে বারাহীন-এ-আহমদিয়া গ্রন্থ চারটি খণ্ডে রচনা করেন, যা ১৮৮২ থেকে ১৮৮৪ সালের মধ্যে সম্পূর্ণ হয়।

১৮৮২ সালে তিনি তাঁর ঐশী নিয়োগ (মামুরিয়ত) সম্পর্কে প্রথম ওহি লাভ করেন। এতে আল্লাহ তাআলা তাঁকে সম্বোধন করে বলেন-

قُلْ اِنِّیْ اُمِرْتُ وَاَنَا اَوَّلُ الْمُؤْمِنِیْنَ

"বল, আমি আল্লাহর পক্ষ থেকে নিযুক্ত হয়েছি এবং আমিই প্রথম বিশ্বাসী।

(বারাহীন-এ-আহমদিয়া, চতুর্থ খণ্ড, পৃ. ৫০২-৫০৩; সূত্র: তাযকিরা, পৃ. ৩৫, কাদিয়ান সংস্করণ)

এই ওহির পর তাঁর মাধ্যমে একের পর এক মু'জিজা ও নিদর্শনের ধারাবাহিকতা শুরু হয়। তিনি ইসলামের কর্তৃত্ব ও বিজয়ের পথসমূহ দেখিয়ে দেওয়ার জন্য আল্লাহর কাছে আন্তরিকভাবে দোয়া করতে থাকেন। এরই পরিণতিতে তিনি কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াতটি ওহি হিসেবে লাভ করেন-

هُوَ الَّذِیْ اَرْسَلَ رَسُوْلَهٗ بِالْهُدٰی وَ دِیْنِ الْحَقِّ لِیُظْهِرَهٗ عَلَی الدِّیْنِ کُلِّهٖ (الصف:10:(10

(সূরা আস-সাফ, ৬১:১০)

তিনি এর ব্যাখ্যায় বলেন

"এই কুরআনিক আয়াতটি-হুয়া ল্লাযী আরসালা রাসূলাহূ আলা আদ-দীন কুল্লিহি-আমার ওপর ওহি করা হয়েছে; অর্থাৎ, আল্লাহই তাঁর রাসূলকে হিদায়াত ও সত্য দ্বীনসহ প্রেরণ করেছেন, যাতে তিনি সেই দ্বীনকে অন্য সকল দ্বীনের ওপর জয়যুক্ত করেন। এই ওহির মাধ্যমে আমাকে বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে যে আল্লাহ তাআলা আমাকে এ উদ্দেশ্যেই প্রেরণ করেছেন, যাতে আমার হাতে তিনি ইসলামকে সকল ধর্মের ওপর বিজয়ী করেন। এখানে স্মরণ রাখা উচিত যে এটি কুরআন শরিফের এক মহিমান্বিত ভবিষ্যদ্বাণী, যার বিষয়ে আলেম ও গবেষকদের সর্বসম্মত মত হলো-এটি মসীহে মওউদের হাতে পূর্ণতা লাভ করবে।" (তিরিয়াকুল কুলুব, পৃ. ৪৭)

মসীহ ও মাহদী হওয়ার দাবি করার পর বিভিন্ন ধর্মের নেতারা তাঁর বিরোধিতা আরও তীব্র করে তোলে। তখন তিনি সমগ্র বিশ্বের সামনে নিদর্শন প্রদর্শনের জন্য প্রকাশ্য আহ্বান জানান। এ প্রেক্ষিতে কাদিয়ানের হিন্দুরা আবেদন করে যে, প্রতিবেশী হওয়ার কারণে তারাই নিদর্শন দেখার অধিক দাবি রাখে। তখন তাঁর ওপর এই ওহি নাযিল হয়-

"তোমাদের বিষয়টির ফয়সালা হোশিয়ারপুরে হবে।"

(সীরাতুল মাহদী, খণ্ড ১, বর্ণনা নং ৮৮)

অতঃপর তিনি হোশিয়ারপুরে গমন করেন এবং সেখানে চল্লিশ দিন আল্লাহর দরবারে অশ্রুসিক্ত বিনয় ও আকুতিতে দোয়া করেন। সেখানে তাঁকে এমন এক পুত্রের সুসংবাদ দেওয়া হয়, যার মাধ্যমে ইসলাম সারা বিশ্বে বিস্তৃত হবে, যার খ্যাতি পৃথিবীর প্রান্তসীমা পর্যন্ত পৌঁছাবে এবং যার দ্বারা জাতিসমূহ কল্যাণ লাভ করবে।

এই মহিমান্বিত পুত্র-যার সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছিল-তিন বছর পর, ১২ জানুয়ারি ১৮৮৯ সালে জন্মগ্রহণ করেন। ১৪ মার্চ ১৯১৪ সালে তিনি হযরত মসীহে মওউদ (আলাইহিস সালাম)-এর দ্বিতীয় খলিফা হিসেবে খিলাফতের আসনে অধিষ্ঠিত হন। 'মুসলেহ-এ-মওউদ'-এর ভবিষ্যদ্বাণীতে তাঁর সম্পর্কে যে সকল গুণাবলি ও সংবাদ দেওয়া হয়েছিল-যার অনেকগুলো এই সংখ্যার অন্যত্র আলোচিত হয়েছে-সবই তাঁর পবিত্র সত্তায় পূর্ণতা লাভ করে। এর মধ্যে বলা হয়েছিল যে, তিনি বিজয় ও সাফল্যের চাবিকাঠি হবেন; তাঁর মাধ্যমে আধ্যাত্মিকভাবে মৃতরা জীবিত হবে; ইসলামের মর্যাদা ও আল্লাহর বাণীর মহিমা প্রকাশ পাবে; তিনি মসীহী স্বভাবের অধিকারী হবেন; তিনি প্রখর বুদ্ধিমান, বিচক্ষণ ও কোমলচিত্ত হবেন; বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ জ্ঞান দ্বারা পরিপূর্ণ হবেন; তিনি আল্লাহর এক নূর হবেন; তাঁর ওপর ঐশী কালাম অবতীর্ণ হবে; আল্লাহর ছায়া তাঁর মাথার ওপর থাকবে; তাঁর খ্যাতি পৃথিবীর প্রান্তসীমা পর্যন্ত পৌঁছাবে; এবং জাতিসমূহ তাঁর দ্বারা কল্যাণ লাভ করবে।

আল্লাহ সাক্ষী-এই সকল নিদর্শন হযরত মুসলেহ-এ-মওউদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর জীবদ্দশাতেই পূর্ণ হয়েছে এবং কিয়ামত পর্যন্ত পূর্ণ হতে থাকবে।

আল্লাহর নির্দেশে তিনি ১৯৪৪ সালে মুসলেহ-এ-মওউদ হওয়ার দাবি ঘোষণা করেন এবং শপথসহ তা ব্যক্ত করেন। তিনি অর্ধশতাব্দীরও অধিক সময় খিলাফতের আসনে অধিষ্ঠিত থাকেন। এমন এক সময়ে তিনি খলিফা হন, যখন আপন-পর-সকলেই তাঁর বিরোধী ছিল এবং বিশ্বযুদ্ধের কারণে বিশ্বের অর্থনৈতিক অবস্থা চরমভাবে অবনতির দিকে যাচ্ছিল।

এমন পরিস্থিতিতে তিনি ইসলামের তবলিগের পতাকা নিজ পবিত্র হাতে ধারণ করেন, এবং অল্প সময়ের মধ্যেই ভারতের সীমানা ছাড়িয়ে এশিয়ার অন্যান্য দেশ, ইউরোপ, আফ্রিকা ও অন্যান্য মহাদেশে ইসলামের পতাকা উত্তোলিত হয়। এই মহাযজ্ঞে হযরত মসীহে মওউদ (আলাইহিস সালাম)-এর সাহাবাগণ তাঁর সঙ্গে এমনভাবেই অংশ নেন, যেমন রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সাহাবাগণ হযরত উমর (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর সঙ্গে ছিলেন। লন্ডনে ইসলামের পতাকা উত্তোলনের জন্য হযরত চৌধুরী ফতেহ মুহাম্মদ সিয়াল (রা.)-কে প্রেরণ করা হয়। মরিশাসে ইসলামের পতাকা বহন করেন হযরত সুফি গোলাম মুহাম্মদ (রা.)। আমেরিকায় যান হযরত মুফতি মুহাম্মদ সাদিক (রা.)। আফ্রিকার ভাগ্য জাগ্রত হয় হযরত মৌলভী আব্দুর রহিম নাইয়ার (রা.)-এর মাধ্যমে। সুদূরপ্রাচ্যে নিদ্রিত আত্মাগুলোকে জাগাতে যান হযরত মৌলভী রহমত আলী (রা.), আর দামেস্ক ও ফিলিস্তিনের ভাগ্য জাগাতে গমন করেন হযরত সাঈদ জায়নুল আবিদীন ওয়ালিউল্লাহ শাহ (রা.)।

এরপর ১৯৩৪ সাল থেকে হযরত মুসলেহ-এ-মওউদ (রা.)-এর সূচিত বরকতময় আন্দোলন 'তাহরিক-এ-জাদিদ' ইসলামের বিজয় যাত্রার জন্য আধ্যাত্মিক তরবারি ধারণ করে। আজ বিশ্বের শত শত দেশে ওয়াকিফীন-এ-জিন্দেগীর এক বাহিনী ইসলামের শান্তির বার্তা পৌঁছে দিতে ছড়িয়ে পড়েছে। ধনী-গরিব নির্বিশেষে প্রতিটি আহমদী একদিকে জীবন উৎসর্গের জিহাদে এবং অন্যদিকে আর্থিক কুরবানির জিহাদে অংশগ্রহণ করেছে। ফলস্বরূপ, একদিকে তাহরিক-এ-জাদিদ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে ইসলামের প্রচারে নিয়োজিত, অন্যদিকে ওয়াকফ-এ-জাদিদের মাধ্যমে গ্রামেগঞ্জে তবলিগ ও তরবিয়তের বিস্তৃত নেটওয়ার্ক গড়ে উঠেছে। আহমদিয়াতের মাধ্যমে আজ ইসলামের এই বার্তা বিশ্বের ২১৬টি দেশে পৌঁছে গেছে।

এত সব কিছু কি আল্লাহ তাআলার সাহায্য ও সমর্থন ছাড়া সম্ভব? আর এই মহিমান্বিত সাফল্য কি এ কথার জীবন্ত প্রমাণ নয় যে, হযরত মসীহে মওউদ (আলাইহিস সালাম)-কে হযরত মুসলেহ-এ-মওউদ সম্পর্কে প্রদত্ত এই ওহি-"তার খ্যাতি পৃথিবীর প্রান্তসীমা পর্যন্ত পৌঁছাবে এবং জাতিসমূহ তার দ্বারা কল্যাণ লাভ করবে-নিশ্চয়ই সেই একই সত্য আল্লাহর পক্ষ থেকে ছিল, যিনি রসুলুল্লাহ (সা.)-কে প্রেরণ করেছিলেন; যাঁর ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী হযরত মির্জা গোলাম আহমদ কাদিয়ানি আবির্ভূত হন; যিনি মুসলেহ-এ-মওউদের আগমনের সুসংবাদ দিয়েছিলেন; এবং যিনি সেই সুসংবাদের প্রতিটি শব্দ সত্য প্রমাণ করে দেখিয়েছেন?

এই সকলের জন্য সমস্ত প্রশংসা আল্লাহরই প্রাপ্য।

****

"ইসলামের সাহায্যকল্পে সুদ ব্যবহারের অনুমতি কেবল একটি নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে এবং নির্দিষ্ট যুগের জন্য প্রযোজ্য।" [হযরত মসীহ মওউদ (আ.)]

মহান আল্লাহ্‌র বাণী

আল্লাহ্ তোমাদের বোঝা লঘু করিতে চাহেন, কারণ মানুষকে দুর্বল করিয়া সৃষ্টি করা হইয়াছে। (আন-নিসা: ২৯)

দোয়াপ্রার্থী: Late Shohrae Alam & Alia Bibi
From-Mahmood Alam Sb. Barisha, 24 PGS (S)

যুগ ইমামের বাণী

জ্ঞান বলতে যুক্তি কিম্বা দর্শনশাস্ত্রকে বোঝানো হয় না, বরং প্রকৃত জ্ঞান সেটাই যা আল্লাহ তা'লা (মানুষকে) কেবল নিজ কৃপাগুণে দান করেন।

(মালফুযাত, ১ম খণ্ড, পৃ: ১৯৫)

দোয়াপ্রার্থী: Late Haji Ansar Mandal
From-Rezuwan Islam Mandal. Bithari, 24 PGS (N)

জুমআর খুতবা

আল্লাহর রাসূল (সা.) একমাত্র এক সত্তার প্রতি গভীর প্রেমে নিমগ্ন ও নিবেদিত হয়ে পড়েছিলেন, এবং তারপর তিনি এমন কিছু লাভ করেছিলেন যা দুনিয়ায় আগে কখনো কেউ লাভ করেনি। আল্লাহ তা'আলার প্রতি তাঁর ভালোবাসা ছিল এতই গভীর যে সাধারণ মানুষ পর্যন্ত বলতে শুরু করেছিল–

'ইশ্ ?ক?া মুহাম্মাদুন 'আলা রাব্বিহী'–অর্থাৎ মুহাম্মদ (সা.) তাঁর রবের প্রেমে পড়ে গেছেন।

(হযরত মির্জা গোলাম আহমদ, মসীহে মওউদ আলাইহিস সালাম)

একদিকে তাঁর হৃদয় আল্লাহ তা'আলার ভালোবাসার ব্যথায় পূর্ণ ছিল, আর অন্যদিকে ছিল আল্লাহর সৃষ্টির প্রতি মমতা ও তাদের ধ্বংস থেকে রক্ষা করার তীব্র আকাঙ্ক্ষা।

আল্লাহ তা'আলার ভালোবাসা অর্জনের পদ্ধতিও আমাদের আল্লাহর রাসূল (সা.)–এর বরকতময় আদর্শ থেকেই শিখতে হবে।

নিজ প্রভুর ভালোবাসা কামনা করে আল্লাহর রাসূল (সা.) এ দোয়া করতেন–

আল্লাহুম্মা ইন্নী আস্ ?আলুকা হুব্বাকা, ওয়া হুব্বা মান্ ইউহিব্বুকা, ওয়াল–'আমালাল্লাযী ইউবাল্লিগুনী হুব্বাকা। আল্লাহুম্মাজ্'আল হুব্বাকা আহাব্বা ইলাইয়া মিন নাফসী ওয়া আহ্লী ওয়া মিনাল মা–ইল বারিদ।

"হে আল্লাহ! আমি তোমার ভালোবাসা চাই, আর তাদের ভালোবাসাও চাই যারা তোমাকে ভালোবাসে, এবং এমন কাজের তাওফিক চাই যা আমাকে তোমার ভালোবাসার কাছে পৌঁছে দেবে। হে আল্লাহ! তুমি তোমার ভালোবাসাকে আমার নিজের সত্তা, আমার পরিবার এবং ঠান্ডা পানির চেয়েও বেশি প্রিয় করে দাও।"

অতএব, এই দোয়াই আজ প্রত্যেক সেই ব্যক্তির করা উচিত, যে আল্লাহর রাসূল (সা.)–এর প্রতি ভালোবাসার দাবি করে এবং যে আল্লাহ তা'আলার প্রতি ভালোবাসা প্রকাশ করতে চায়–আল্লাহর প্রিয় বান্দা হতে চায় এবং আল্লাহ তা'আলার অনুগ্রহ লাভ করতে চায়।

আল্লাহর রাসূল ?–এর সমগ্র জীবনই ঐশী প্রেমে নিমজ্জিত ছিল। এই ঐশী প্রেমের দৃশ্যাবলি প্রত্যক্ষ করে মক্কার লোকেরা বলতে শুরু করেছিল–

ইন্না মুহাম্মাদান 'আশিকা রাব্বাহু–অর্থাৎ মুহাম্মদ (সা.) সত্যিই তাঁর রবের প্রেমিক হয়ে গেছেন।

"আমার হৃদয়ের ফল হলো আল্লাহর যিকির, আর আমার আকুলতা আমার রবের জন্য।"

(আল্লাহর রাসূল (সা.)–এর বাণী)

"সাহাবায়ে কিরাম (রাদিয়াল্লাহু আনহুম) সেই সত্যনিষ্ঠ পুরুষের চেহারা দেখেছিলেন, যাঁর আল্লাহর প্রেমিক হওয়ার সাক্ষ্য কুরাইশের কাফিরদের মুখ থেকেও স্বতঃস্ফূর্তভাবে বেরিয়ে এসেছিল। তাঁর প্রতিদিনের মুনাজাত, স্নেহময় সিজদা, আনুগত্যে সম্পূর্ণ বিলীন হওয়ার অবস্থা, পরিপূর্ণ প্রেম ও গভীর অনুরাগের উজ্জ্বল নিদর্শন তাঁর মুখমণ্ডলে প্রত্যক্ষ করে এবং সেই পবিত্র মুখে নূরে ইলাহীর বর্ষণ দেখতে পেয়ে তারা বলত–

'আশেকা মুহাম্মাদুন 'আলা রাব্বিহী'–অর্থাৎ মুহাম্মদ (সা.) তাঁর রবের প্রেমে পড়ে গেছেন।"

(হযরত মির্জা গোলাম আহমদ, মসীহে মওউদ আলাইহিস সালাম)

এটাই ছিল আল্লাহর রাসূল (সা.)–এর আদর্শ ও আল্লাহ তা'আলার প্রতি তাঁর ভালোবাসার অনন্য দৃষ্টান্ত। এই আদর্শের প্রভাবেই সাহাবায়ে কিরামের মধ্যে এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধিত হয়েছিল এবং তারা এমন এক মর্যাদায় অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন, যা এর আগে কল্পনাও করা যায়নি। এটাই সেই পূর্ণাঙ্গ ও পরিপূর্ণ শিক্ষা, যা তাঁর সত্যনিষ্ঠ খাদেম–হযরত মসীহে মওউদ মির্জা গোলাম আহমদ আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম–গ্রহণ করেছিলেন।

আজ আমরা যখন দাবি করি যে আমরা আল্লাহর রাসূল ?–এর প্রকৃত অনুসারী, এবং তাঁর সত্যনিষ্ঠ খাদেম মসীহে মওউদের হাতে বায়'আত করে আমরা এই অঙ্গীকার নবায়ন করেছি যে ভবিষ্যতে আমরা আমাদের জীবনকে আল্লাহ তা'আলার নির্দেশ অনুযায়ী গড়ে তোলার চেষ্টা করব–তখন আমাদের এদিকে বিশেষ মনোযোগ দেওয়া উচিত যে আমাদের প্রতিটি কাজ সম্পূর্ণভাবে আল্লাহ তা'আলার জন্যই হতে হবে এবং আমাদের তাঁর ভালোবাসায় অগ্রসর হওয়ার চেষ্টা করতে হবে। তখনই আমরা আল্লাহ তা'আলার অনুগ্রহের উত্তরাধিকারী হতে পারব, আল্লাহর রাসূল (সা.)–এর উম্মতের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার প্রকৃত হক আদায় করতে পারব, মসীহে মওউদ আলাইহিস সালামের বায়'আতের হক আদায় করতে পারব এবং তাঁর প্রকৃত বিশ্বাসীদের মধ্যে গণ্য হতে পারব।

সৈয়্যদনা আমিরুল মো'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক লন্ডনের টিলফোর্ড স্থিত মসজিদে **মুবারকে প্রদত্ত** ২৬ শে ডিসেম্বর, ২০২৫, **এর জুমুআর খুতবা (২৬ ফতাহ ১৪০৪ হিজরী শামসী)**

সৌজন্যে: আল-ফযল ইন্টারন্যাশনাল লন্ডন

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ

أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ- بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ-

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ- الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ- مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ- إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ-

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ- صِرَاطَ الَّذِيْنَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ-

তাশাহ্হুদ, তা'উয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন, গত খুতবায় আমি মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)–এর সীরাত (তথা জীবনচরিতের) আলোকে কিছু কথা বলেছিলাম। আজ খোদাপ্রেমের প্রেক্ষাপটে তাঁর জীবনচরিতের কিছু দিক তুলে ধরব। হতে পারে কিছু কথা সংক্ষেপে পূর্বেও আলোচিত হয়েছে, তবে এখানে কোনো কোনো ক্ষেত্রে বিশদ বিবরণও রয়েছে।

আমরা দেখতে পাই, তাঁর জীবনচরিতের এই দিক থেকে তাঁর প্রতি আল্লাহ্ তা'লার ভালোবাসারও বহিঃপ্রকাশ ঘটে। কেবলমাত্র আল্লাহ্ তা'লার প্রতি তাঁর ভালোবাসাই নয়, বরং তাঁর প্রতিও আল্লাহ্ তা'লার (গভীর) ভালোবাসা ছিল। তাঁর প্রতি আল্লাহ্ তা'লার ভালোবাসার নিদর্শন হিসেবে তিনি তাঁকে পথপ্রদর্শন করেছেন। পরবর্তীতে এই ভালোবাসায় আরো সিক্ত হয়ে তিনি (সা.) বিস্ময়করভাবে নিজের উম্মতের (সদস্যদের) তরবিয়ত করেছেন এবং উম্মতকে পথপ্রদর্শনও করেছেন।

আল্লাহ্ তা'লা তাঁর প্রতি যে শিক্ষা অবতীর্ণ করেছেন, উম্মতের পথনির্দেশনার

জন্য তাদের কাছে তিনি নিখুতভাবে তা পৌঁছিয়েছেন; এর জন্য তাঁর হৃদয়ে এক গভীর বেদনা ছিল। মূলত এই বেদনার কারণেই আল্লাহ্ তা'লা তাঁকে পথনির্দেশনা দিয়েছেন, কেননা তাঁকে উম্মতকেও পথপ্রদর্শন করতে হবে। কিংবা এভাবে বলা যায়, একদিকে তাঁর হৃদয়ে ছিল আল্লাহ্‌র ভালোবাসার বেদনা, আর অন্যদিকে ছিল আল্লাহ্‌র সৃষ্টির প্রতি মমত্ববোধ এবং তাদেরকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করার তীব্র আকাঙ্ক্ষা।

আল্লাহ্ তা'লা পবিত্র কুরআনের সূরা আদ-দুহায় বলেন, وَوَجَدَكَ ضَآلًّا فَهَدٰى۔ অর্থাৎ 'যখন তিনি তোমাকে তোমার জাতির চিন্তায় ব্যাকুল দেখেন, তখন তাদের সংশোধনের সঠিক পথ তোমাকে বাতলে দিয়েছেন।' আর আল্লাহ্ তা'লার প্রতি ভালোবাসার নিরিখে এই আয়াতের অর্থ দাঁড়াবে– আল্লাহ্ তা'লা বলছেন, 'আমি তোমাকে আমার ভালোবাসায় অত্যন্ত ব্যথিত পেয়েছি এবং পরিশেষে তোমাকে সেই পথ দেখিয়েছি যাতে পরিচালিত হয়ে তুমি আমার সান্নিধ্যে পৌঁছতে পেরেছ।' ইমাম রাযী প্রণীত তফসীরে কবীর-এ সূরা আদ-দুহার এই আয়াত তথা, وَوَجَدَكَ ضَآلًّا فَهَدٰى۔ –এর ব্যাখ্যায় লেখা হয়েছে, 'যালাল' শব্দের একটি অর্থ ভালোবাসাও হয়। যেমন আল্লাহ্ তা'লার বাণীতে বলা হয়েছে, اِنَّكَ لَفِيْ ضَلٰلِكَ الْقَدِيْمِ –এখানে ???? মানে ভালোবাসা। কাজেই এর মর্মার্থ হবে– তুমি আমার প্রেমিক; তাই আমি তোমাকে এমন সব পথের দিকে পরিচালিত করেছি যার মাধ্যমে তুমি তোমার প্রেমাস্পদের সেবা করে নৈকট্যের সোপানগুলো অতিক্রম করতে পারো।" (মাফাতিহুল গাইব, খণ্ড-১৬, পৃ:১৯৭)

এর মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'লা সনদ দিয়ে দিয়েছেন যে, তুমি আল্লাহ্‌র ভালোবাসায় বিভোর।

তাঁর সাথে আল্লাহ্ তা'লার এই ভালোবাসার বহিঃপ্রকাশ আমরা বিভিন্ন বর্ণনায় দেখতে পাই। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এক জায়গায় বলেন: যে ব্যক্তি কুরআনের বাচনভঙ্গি সম্পর্কে অবগত, তার কাছে এটি গোপন নয় যে, দয়াময় ও কৃপালু আল্লাহ্ কখনও কখনও তাঁর বিশেষ বান্দাদের জন্য এমন কিছু শব্দ ব্যবহার করেন যা বাহ্যত শুনতে কিছুটা অসুন্দর মনে হতে পারে, কিন্তু অর্থের নিরিখে তা অত্যন্ত প্রশংসনীয় ও স্তুতিমূলক বাক্য হয়ে থাকে। [বাহ্যত এই শব্দটির সাধারণ ব্যবহার দেখলে মনে হয় শব্দটি উপযুক্ত নয়; কেননা যাল শব্দের অর্থ ভ্রষ্টতা।কিন্তু এক্ষেত্রে অর্থ তা নয়।] যখন আল্লাহ্ তাঁর বিশেষ বান্দাদের জন্য কোনো বিশেষ ক্ষেত্রে সেটি ব্যবহার করেন, তখন এর অর্থ বদলে যায়। যেমনটি আল্লাহ্ তা'লা তাঁর নবী (সা.) সম্পর্কে বলেছেন, وَوَجَدَكَ ضَآلًّا فَهَدٰى۔ [অর্থাৎ, আর তিনি তোমাকে তোমার জাতির প্রেমে আত্মহারা পেয়েছেন এবং তিনি তোমাকে তাদের সংশোধনের জন্য হিদায়াত দান করেছেন (সূরা আদ-দুহা: ৮)]। এটি জানা কথা, অভিধানবিদদের মুখে মুখে 'যাল' শব্দের প্রচলিত ও সুপরিচিত অর্থ হলো পথভ্রষ্ট। তিনি (আ.) বলেন, এ দৃষ্টিকোণ থেকে এ আয়াতের অর্থ দাঁড়ায়, হে রসূল! আল্লাহ্ তা'লা তোমাকে পথভ্রষ্ট পেয়েছেন এবং তোমাকে হিদায়াত দিয়েছেন। [অর্থাৎ সাধারণ লোকেরা এই অর্থ করে থাকে।] তিনি (আ.) বলেন, অথচ মহানবী (সা.) কখনও পথভ্রষ্ট হন নি। কেউ যদি মুসলমান হয়েও এই বিশ্বাস পোষণ করে যে, মহানবী (সা.) তাঁর জীবনের কোনো এক পর্যায়ে ভ্রষ্টতামূলক কার্যকলাপে লিপ্ত ছিলেন– তবে সে কাফির, বে-দ্বীন এবং শরীয়তের বিধান অনুযায়ী দণ্ডনীয়। বরং এখানে এ আয়াতের সেই অর্থ করা প্রয়োজন যা আয়াতের প্রেক্ষাপট থেকে বোঝা যায়। আর তা হলো, মহানবী (সা.) সম্পর্কে প্রথমে মহাপরাক্রমশালী আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন اَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيْمًا فَاٰوٰى۔ وَوَجَدَكَ ضَآلًّا فَهَدٰى۔ وَوَجَدَكَ عَآئِلًا فَاَغْنٰى, অর্থাৎ, আল্লাহ্ তা'লা তোমাকে এতিম ও অসহায় পেয়েছেন এবং নিজের সন্নিধানে আশ্রয় দিয়েছেন। আর তোমাকে 'যাল' অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'লার প্রেমে বিভোর ও আত্মহারা পেয়েছেন, তাই আল্লাহ্ তা'লা তোমাকে নিজের দিকে টেনে নিয়েছেন আর তোমাকে নিঃস্ব দেখতে পেয়ে তিনি তোমাকে প্রাচুর্য দান করেছেন।

(আয়েনায়ে কামালাতে ইসলাম, রূহানী খাযায়েন, ৫ম খণ্ড,পৃ: ১৭০-১৭১)

হযরত আকদাস মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, মহানবী (সা.) যেহেতু নিজের অভ্যন্তরীণ পবিত্রতা, হৃদয়ের উদারতা, নিষ্কলুষতা, লজ্জা-সম্ভ্রম, সত্যবাদিতা, বিশ্বস্ততা ও বিশ্বাসযোগ্যতায়, আল্লাহ্‌র ওপর ভরসা ও আস্থা এবং খোদাপ্রেমের সকল আবশ্যকীয় বৈশিষ্ট্যের ক্ষেত্রে সব নবীর চেয়ে শ্রেষ্ঠ, উচ্চমর্যাদাসম্পন্ন, সবচেয়ে মহান, পূর্ণতম এবং সবচেয়ে উজ্জ্বল ও সবচেয়ে স্বচ্ছ ছিলেন, তাই মহান আল্লাহ্ তাঁকে পূর্ণতার আতরে সবচেয়ে বেশি সুরভিত করেছেন। আর সেই হৃদয় ও বক্ষ যা পূর্বাপর সবার অন্তর ও হৃদয়ের চেয়ে বেশি প্রশস্ত, পবিত্র, নিষ্পাপ এবং জ্যোতির্ময় ছিল, কেবল সেটিই এমন ওহী লাভের যোগ্য ছিল যা পূর্বাপর সবার ওহীর চেয়ে অধিক শক্তিশালী ও পূর্ণাঙ্গ হবে; [অর্থাৎ অনেক সুদৃঢ় এবং পূর্ণাঙ্গ হবে;] আর সুউচ্চ ও কামিল হয়ে ঐশী গুণাবলি পূর্ণরূপে প্রদর্শন করার জন্য (সেই হৃদয়) হবে এক অতীব স্বচ্ছ, বিশাল ও প্রশস্ত দর্পণস্বরূপ। এই দর্পণে আমরা আল্লাহ্ তা'লার গুণাবলিও দেখতে পাই এবং আল্লাহ্ তা'লার মহান সত্তার প্রতিটি দিকও আমরা মহানবী (সা.)-এর ব্যক্তিসত্তায় এবং তাঁর শিক্ষায় দেখতে পাই।

"এ কারণেই পবিত্র কুরআন এমন সব পরম শ্রেষ্ঠত্বধারণ করে, যার প্রখর জ্যোতি এবং তীব্রচ্ছটার সামনে পূর্বের সকল ঐশী গ্রন্থের ঔজ্জ্বল্য ম্লান হয়ে গেছে। [অর্থাৎ, পূর্বের সকল ঐশীগ্রন্থ এবং সেগুলোর বাণীর ঔজ্জ্বল্য এর (তথা কুরআনের) সামনে কোনো মূল্যই রাখে না।] কোনো মস্তিষ্ক এমন কোনো (নতুন) সত্য উদ্ভাবন করতে পারবে না যা আগে থেকেই এতে বিদ্যমান নেই। [পবিত্র কুরআনে সব কিছুই বিদ্যমান রয়েছে, আর পৃথিবীর মানুষ এমন কোনো কিছু উদ্ভাবন বা আবি ষ্কার করতে পারবে না যা পবিত্র কুরআনে নেই; তবে তা অনুধাবন করার প্রয়োজন রয়েছে।] কারো মস্তিষ্ক এমন কোনো যৌক্তিকদলিল উপস্থান করতে পারবে না যা পূর্বেই এটি (অর্থাৎ কুরআন) উপস্থাপন করে নি। যেভাবে লক্ষ লক্ষ হৃদয়ে এটি (কুরআন) শক্তিশালী ও কল্যাণকর প্রভাব সৃষ্টি করেছে অন্য কোনো বক্তব্য তদ্রুপ শক্তিশালী প্রভাব হৃদয়ে সৃষ্টি করতে পারবে না। তিনি (আ.) বলেন, নিঃসন্দেহে এটি আল্লাহ্ তা'লার সুমহান গুণাবলি প্রদর্শনের স্বচ্ছতম দর্পণ। তত্ত্বজ্ঞানের সুউচ্চ মানে উপনীত হওয়ার জন্য একজন সত্যান্বেষীর যা যা প্রয়োজন, সেগুলো সবই এতে বিদ্যমান।"

(সুরমাহ চশমায়ে আরিয়া, রূহানী খাযায়েন, ২য় খণ্ড, পৃ: ৭০-৭১)

যে শিক্ষা মহানবী (সা.)-এর প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে তা এমন পবিত্র, যা ছিল সবকিছুর উর্ধ্বে , সব শিক্ষার উর্ধ্বে ছিল। সকল ঐশী গ্রন্থাবলির তুলনায় অনেক উন্নত, পূর্ণাঙ্গ ও উৎকৃষ্ট শিক্ষা হচ্ছে পবিত্র কুরআনের শিক্ষা। এ কারণেই তাঁর সত্তাও এ শিক্ষার ধারক। অর্থাৎ তিনিও হলেন কামিল ও পূর্ণতম। এটি তিনি (সা.) প্রমাণ করে দেখিয়েছেন। যে গ্রন্থ তাঁর প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে তা এ কারণেই হয়েছে যে, তাঁর সত্তা সকল মানবের চেয়ে পূর্ণ ছিল আর তিনিই সেই পূর্ণ মানব যাঁর মোকাম বা উচ্চতায় কেউ পেঁ ছিতে পারবে না। তবে আল্লাহ্ তা'লা একথাওবলেছেন, তিনি তোমাদের জন্য আদর্শ , তাঁকে অনুসরণ করতে চেষ্টা করো। এ কারণেই আল্লাহ্ তা'লা তাঁর মাধ্যমে এই ঘোষণাও করিয়েছেন যে, লোকদেরকে বলে দাও, قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُوْنِيْ يُحْبِبْكُمُ اللّٰهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ অর্থাৎ, "তুমি বলে দাও, 'হে লোক সকল! তোমরা যদি আল্লাহ্‌কে ভালোবাসো তাহলে আমার অনুসরণ করো, এমতাবস্থায় তিনিও তোমাদের ভালোবাসবেন এবং তোমাদের পাপ ক্ষমা করবেন; বস্তুত আল্লাহ্ অতীব ক্ষমাশীল, বার বার কৃপাকারী'।"

অতএব, আল্লাহ্ তা'লার ভালোবাসা লাভ করার রীতিও তাঁর আদর্শ থেকেই শিখতে হবে।

আল্লাহ্ তা'লার প্রতি মহানবী (সা.)-এর ভালোবাসার যে দৃশ্য আমরা দেখতে পাই,হাদীসে সে সংক্রান্ত কিছু রেওয়ায়েত রয়েছে। মহানবী (সা.) তঁার প্রভুর ভালোবাসা লাভের জন্য এই দোয়া করতেন:

اَللّٰهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ حُبَّكَ، وَحُبَّ مَنْ يُحِبُّكَ، وَالْعَمَلَ الَّذِيْ يُبَلِّغُنِي حُبَّكَ، اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ حُبَّكَ أَحَبَّ إِلَيَّ مِنْ نَفْسِيْ وَأَهْلِيْ وَمِنَ الْمَاءِ الْبَارِدِ۔

অর্থাৎ, হে আল্লাহ্। আমি তোমার নিকট তোমার ভালোবাসা যাচনা করি, আর তার ভালোবাসা চাই যে তোমাকে ভালোবাসে, আর এমন কাজের সামর্থ্য যাচনা করি যার মাধ্যমে তোমার ভালোবাসা লাভ হবে। হে আল্লাহ্! তোমার ভালোবাসাকে আমার কাছে আমার নিজপ্রাণ, পরিবার এবং সুশীতল পানির চেয়েও প্রিয়তর করে দাও।

এটি হচ্ছে সেই দোয়া যা এখন প্রত্যেক এমন ব্যক্তির করা উচিত যে মহানবী (সা.)-কে ভালোবাসার দাবি করে, আর যে আল্লাহ্ তা'লার প্রতি ভালোবাসার বহিঃপ্রকাশ ঘটাতে চায়, আল্লাহ্ তা'লার প্রিয়প্রাত্র হতে চায় এবং আল্লাহ্ তা'লা তার প্রতি স্বীয় কৃপা বর্ষণ করবেন।

একইভাবে আরেকটি রেওয়ায়েতে বর্ণিত হয়েছে, হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন ইয়াযীদ খাতমীআনসারী (রা.) বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.) এই দোয়া করতেন, 'হে আল্লাহ্ আমাকে তোমার ভালোবাসা দান করো আর তার ভালোবাসা দান করো যার ভালোবাসা তোমার সন্নিধানে আমার জন্য লাভজনক হবে। হে আল্লাহ্! আমার প্রিয় বিষয়গুলো যা তুমি আমাকে দান করেছ, সেগুলোকে তোমার প্রিয় কাজগুলো করার সামর্থ্য লাভের জন্য আমার শক্তির উৎস বানিয়ে দাও। আর আমার প্রিয় যেসব জিনিস তুমি আমার থেকে পৃথক করে দাও, সেগুলোকে আমার জন্য তোমার পছন্দনীয় বিষয়সমূহ অর্জনের শক্তির উৎস বানিয়ে দাও।'

(জামে তিরমিযি, কিতাবুদ দাওয়াত, হাদীস-৩৪৯১)

অতএব, মহানবী (সা.) এই দোয়া করেছেন, তোমার দেওয়া আমার

যুগ খলীফার বাণী

যদি তোমরা ইহকাল ও পরকালের সফলতা এবং মানুষের মন জয় করতে চাও, তবে পবিত্রতা অবলম্বন কর, নিজেকে পরিছন্ন রাখ এবং নিজের উত্তম আচরণের নমুনা প্রদর্শন কর। তবেই তোমরা সফলকাম হবে।

(খুতবা জুমা, প্রদত্ত ১লা জানুয়ারী, ২০১৬)

দোয়াপ্রার্থী: Azkarul Islam, jamat Ahmadiyya Amaipur (Birbhum)

পছন্দের জিনিসগুলোকে তোমার পছন্দের বিষয় অর্জনের জন্য আমার শক্তির মাধ্যম বানিয়ে দাও,অধিক শক্তি দান করো, আর আমি যেন সেসব বিষয় বেশি বেশি অর্জন করি যা তোমার প্রিয়।আর এর মাধ্যমে আমি তোমার অধিক ভালোবাসা অর্জনকারী হই, আর সেসব বিষয় অর্জন করতে পারি যা তোমার প্রিয়। তিনি (সা.) বলেন, যা আমার প্রিয় জিনিস, যেসব জিনিস বা যেসকল মানুষ আমার কাছে প্রিয় মনে হয়, কিন্তু তুমি যদি সেগুলোকে আমার কাছ থেকে পৃথক করে দাও– তাহলে তুমি সেসব জিনিসকে আমার জন্য সেই বিষয়গুলো অর্জনের ক্ষেত্রে শক্তির মাধ্যম বানিয়ে দাও যা তুমি পছন্দ করো। [যেসব জিনিস আমার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে, সেগুলোর কারণে নিরাশ হওয়া উচিত নয়। বরং এরপর আমি যেন পুনরায় শক্তি লাভ করি। অর্থাৎ যেহেতু তা আল্লাহ্ তা'লার প্রিয় ছিল না এবং তিনি আমার থেকে বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছেন, অথবা এটিই আল্লাহ্ তা'লার অভিপ্রায় ছিল, এটিই তাঁর পছন্দ ছিল; তাই যেসবজিনিস আল্লাহ্ তা'লার প্রিয় তা যেন আমি লাভ করি। আল্লাহ্ তা'লা যদি আমার কাছ থেকে সেসব জিনিস নিয়ে নেন যা আল্লাহ্ তা'লার পছন্দ নয়, তাহলে হে আল্লাহ্! তোমার প্রিয় ওপছন্দীয় যেসব বিষয় রয়েছে– সেগুলো লাভ করার শক্তি আমাকে দান করো।] এটি ছিল তাঁর(সা.) আল্লাহ্ তা'লার প্রতি ভালোবাসার বহিঃপ্রকাশ।

অনুরূপভাবে হযরত আয়েশা (রা.) বর্ণনা করেন, ইযা জা- আ নাসরুল্লাহ্ (সূরা আন-নাসর: ০২) অবতীর্ণ হওয়ার পর মহানবী (সা.) এমন কোনো নামায পড়েন নি যার মাঝে তিনি এটি পাঠ করেন নি: سُبْحَانَكَ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِيْ- অর্থাৎ, হে আমাদের প্রভু! তোমার প্রশংসাসহ তুমি পবিত্র। হে আল্লাহ্! তুমি আমাকে ক্ষমা করো। (সহীহ বুখারী, কিতাবুত তফসীর, হাদীস-৪৯৬৭)

আল্লাহ্ তা'লার প্রতি ভালোবাসার একটি ঘটনা বর্ণনা করতে গিয়ে হযরত আয়েশা (রা.) বলেন, আমি এক রাতে রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর পাশে শুয়ে ছিলাম। রাতে আমি তাঁকে [নিজের পাশে] দেখতে পেলাম না। আমি রাতের অন্ধকারে তাঁকে খুঁজতে লাগলাম, তখন আমার হাত তাঁর চরণ স্পর্শ করল। তিনি সিজদাবনত অবস্থায় ছিলেন এবং আল্লাহ্ তা'লার নিকট এই দোয়া করছিলেন যে, আমি তোমার অসন্তুষ্টি থেকে তোমার সন্তুষ্টির আশ্রয় চাই। আর তোমার শাস্তি থেকে তোমার ক্ষমার আশ্রয় চাই। আমি তোমার প্রশংসা গণনা করে শেষ করতে পারব না। তুমি ঠিক তেমনই, যেমনটি তুমি স্বয়ং নিজের প্রশংসা করেছ।

(সহীহ মুসলিম, কিতাবুস সলাত, হাদীস-৭৪৩)

[অর্থাৎ, আমি তো তোমার সেই পরিমাণ প্রশংসা করার সামর্থ্য রাখি না; যা তুমি স্বয়ং নিজের সম্পর্কে বর্ণনা করেছ– সেটিই তোমার প্রকৃত প্রশংসা।] অনুরূপভাবে হযরত আয়েশা (রা.) এক জায়গায় বলেন, এক রাতে রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর আমার ঘরে থাকার পালা ছিল। আমি ঘুমিয়ে পড়লে তিনি নিঃশব্দে বাইরে চলে যান। আমি ধারণা করলাম, সম্ভবত তিনি অন্য কোনো স্ত্রীর ঘরে গিয়েছেন। আমি ঈর্ষাবশত বাইরে বের হলাম; তখন দেখতে পেলাম, তিনি এক টুকরো কাপড়ের পুঁটুলির ন্যায় মাটিতে সিজদায় পড়ে আছেন। আমি তাঁকে বলতে শুনলাম:

سَجَدَلَكَ سَوَادِي وَخَيَالِي وَآمَنَ بِكَ فُؤَادِي رَبِّ هٰذِهٖ يَدِي، وَمَا جَنَيْتُ عَلَى نَفْسِي،
يَا عَظِيْمُ تُرْجَى لِكُلِّ عَظِيْمٍ فَاغْفِرِ الذَّنْبَ الْعَظِيْمَ-

অর্থাৎ, হে আল্লাহ্! তোমার জন্য আমার দেহ ও মন সিজদাবনত, আমার অন্তর তোমার প্রতি ঈমান এনেছে। হে আমার প্রভু! আমার এই দুই হাত তোমার সামনে প্রসারিত আর আমি উভয় হাতে নিজ প্রাণের প্রতি যে অবিচার করেছি তা-ও তোমার সামনে রয়েছে।

[অথচ মহানবী (সা.) তো এমন একজন পূর্ণাঙ্গ মানুষ ছিলেন যাঁর মধ্যে পুণ্য ব্যতীত আর কিছুই দেখা যায় না; কিন্তু তিনিও এটি বলছেন যে, আমি নিজ প্রাণের প্রতি যে যুলুম করেছি তা তোমার সামনে রয়েছে।] হে সুমহান সত্তা, যাঁর নিকট বড়ো থেকে বড়ো বিষয়ের প্রত্যাশা করা হয়। তুমি সমস্ত বড়ো পাপ ক্ষমা করে দাও।

হযরত আয়েশা (রা.) বর্ণনা করেন, এরপর তিনি (সা.) নিজের পবিত্র শির তুললে আমাকে দেখতে পান। তিনি জিজ্ঞেস করেন, কোন জিনিস তোমাকে বাইরে নিয়ে এল? তুমি কেন বাইরে চলে এলে? তুমি তো ঘুমিয়ে ছিলে। তিনি নিবেদন করেন, আমি ধারণার বশবর্তী হয়ে এমনটি করেছি। অর্থাৎ আমার মনে হয়েছিল, আপনি সম্ভবত অন্য কোনো স্ত্রীর ঘরে গিয়েছেন। তিনি (সা.) বলেন, নিশ্চয়ই কোনো কোনো ধারণা পাপে পরিণত হয়। তুমি কি আমার প্রতি সন্দেহ করলে? এটি তো পাপ। [যেমনটি হযরত আয়েশা (রা.) বলেছিলেন, তিনি সন্দেহ করেছিলেন যে, হয়ত অন্য কোনো স্ত্রীর ঘরে চলে গিয়েছেন– সেটিই তিনি জানান। তিনি (সা.) বলেন, এই যে কুধারণা– এগুলো পাপে পর্যবসিত হয়।] আল্লাহ্র নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করো। অতএব, কুধারণা থেকে বাঁচার জন্য প্রতিটি বিষয়ে আল্লাহ্র নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করা তথা ইস্তিগফার করা অত্যন্ত জরুরি। এরপর তিনি (সা.) হযরত আয়েশাকে বলেন, ব্যাপার হলো, জিবরাঈল (আ.) আমার কাছে এসেছিলেন এবং তিনি আমাকে এই শব্দগুলো পড়ার জন্য বলেছিলেন; তাই তুমিও তোমার সিজদায় এগুলো পাঠ কোরো। [এখন যেহেতু তুমি শুনে নিয়েছ, তাই এগুলো পাঠ কোরো।] যে ব্যক্তি এই বাক্যগুলো পাঠ করবে, সে সিজদা থেকে মাথা তোলার পূর্বেই ক্ষমাপ্রাপ্ত হবে।

(মাজমুয়ায়ে জোয়ায়েদ, কিতাবুস সালাত, হাদীস-২৭৭৫)

হ্যাঁ, সাথে এই শর্তও রয়েছে যে, তাকে পূর্ণরূপে আল্লাহ্ তা'লার ওপর ঈমান আনয়নকারীও হতে হবে, বিশ্বাসও পূর্ণ হতে হবে এবং অন্যান্য পুণ্যকর্ম সম্পাদনকারীও হতে হবে। মহানবী (সা.) হযরত আয়েশা (রা.)-কে তো এটিই বলেছেন, কারণ তিনি জানতেন যে, হযরত আয়েশার মান কেমন। কিন্তু কেউ অন্যান্য পুণ্যকর্ম সম্পাদন না করে কেবল এই দোয়াটি পড়ে নিলেই ক্ষমা পেয়ে যাবে– বিষয়টি এমন নয়!

অনুরূপভাবে অন্য এক রেওয়ায়েতে রয়েছে যা আরো বিস্তারিতভাবে সহীহ মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে। হযরত আয়েশা (রা.) বলেন, একরাতে আমার ঘরের পালায় মহানবী (সা.)ঘরে আসেন, নিজের চাদর রাখেন, জুতো খোলেন এবং নিজের পায়ের কাছে রাখেন। এরপর নিজের গায়ের চাদরের এক প্রান্ত বিছানায় বিছিয়ে শুয়ে পড়েন। কিছুক্ষণ পর তিনি যখন ভাবলেন যে, আমি ঘুমিয়ে পড়েছি, তখন তিনি ধীরে ধীরে নিজের চাদর নেন, ধীরে ধীরে নিজের জুতো পরেন, দরজা খোলেন এবং বাইরে চলে যান, এরপর অত্যন্ত সাবধানে দরজাটি বন্ধ করে দেন। আমি আমার ওড়না ও গায়ের চাদর পরে তাঁর (সা.) পিছু নিই। একপর্যায়ে তিনি জান্নাতুল বাকী-তে পৌঁছে যান। তিনি সেখানে নামাযে দাঁড়ান এবং দীর্ঘ কিয়াম করেন। এরপর তিনি তিনবার দুই হাত তোলেন। অতঃপর তিনি ফিরে আসার জন্য ঘুরে দাঁড়ান এবং আমিও ঘুরে দাঁড়াই। তিনি দ্রুত হাঁটেন আর আমিও দ্রুত হাঁটতে থাকি। তিনি গতি আরোবাড়িয়ে দেন, আমিও গতি বৃদ্ধি করি। তিনি আরো দ্রুত চলতে থাকেন, আমিও দ্রুত চলতে থাকি। এরপর তিনি ঘরে আসেন এবং আমি তাঁর আগেই ঘরে প্রবেশ করে শুয়ে পড়ি। তিনি (সা.) যখন ভেতরে আসেন তখন বলেন, হে আয়েশা! তোমার কী হয়েছে? তোমার নিশ্বাস এত দ্রুত ওঠা-নামা করছে কেন? [দ্রুত হাঁটার কারণে তিনি দ্রুত নিশ্বাস ফেলছিলেন। মহানবী (সা.) তা শুনতে পান এবং অনুভব করেন যে, তিনি (রা.) দ্রুত নিশ্বাস নিচ্ছিলেন।] হযরত আয়েশা বলেন, দ্রুত হাঁটার কারণে আমার নিশ্বাসের গতি বেড়ে যায়; কিন্তু আমি বললাম,কিছু হয় নি এবং বিষয়টি এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করলাম। তিনি (সা .) বলেন, তুমি অবশ্যই আমাকে বলবে, অন্যথায় সূক্ষ্মদর্শী ও সর্বজ্ঞ আল্লাহ্ আমাকে বলে দেবেন। আমি বললাম, হে আল্লাহ্র রসূল (সা.)! আমার পিতামাতা আপনার জন্য উৎসর্গিত। এরপর আমি আমার মনে কী চিন্তা এসেছিল এবং আমি কীভাবে তাঁর পেছনে গিয়েছিলাম– সব কথা খুলে বললাম। তিনি (সা.) বলেন, আচ্ছা, তাহলে সেই ছায়াটি তুমিই ছিলে যাকে আমি আমার সামনে দেখেছিলাম? আমি বললাম, হ্যাঁ। তিনি আমার বুকে মৃদু আঘাত করেন যা আমি অনুভব করলাম এবং বলেন, তুমি কি ভেবেছিলে যে, আল্লাহ্ এবং তাঁর রসূল তোমার অধিকার পদদলিত করবেন? হযরত আয়েশা বলেন, মানুষ যা কিছু গোপন করে আল্লাহ্ তা জানেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তা'লা তো জানেনই, আর তিনি তা প্রকাশ করে দিতেন; তাই আমিই বলে দিয়েছি। অর্থাৎ আমার হৃদয়ে যা ছিল তা আমি জানিয়ে দিয়েছি। রসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেন, জিবরাঈল আমার নিকট এসেছিলেন এবং তুমি যখন আমাকে বাইরে যেতে দেখেছ তখন তিনিআমাকে ডেকেছিলেন। যেহেতু তিনি তোমার নিকট বিষয়টি গোপন রেখেছিলেন, তাই আমি তাঁর কথা গ্রহণ করেছি এবং তোমার নিকট বিষয়টি গোপন রেখেছি। এই কারণেই আমি তোমাকে বলি নি এবং তাঁর সাথে চলে গিয়েছি। আমার ধারণা ছিল, তুমি ঘুমিয়ে পড়েছ এবং আমি তোমাকে জাগানো পছন্দ করি নি। তিনি বলেন, তোমাকে বলে যাবার ক্ষেত্রে আমার আশঙ্কা হয়েছিল, তুমি একাকীত্ব বোধ করবে; তুমি হয়ত বলতে, আজ আমি একা। জিবরাঈল (আ.) মহানবী (সা.)-কে বলেছিলেন, আপনার প্রভু আপনাকে নির্দেশ দিচ্ছেন যেন আপনি বাকী-র অধিবাসীদের নিকট যান এবং তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেন। হযরত আয়েশা (রা.) বলেন, আমি নিবেদন করি, হে আল্লাহ্র রসূল (সা.)! আমিও কি এই সওয়াবের অংশ পেতে পারি? আমি তাদের জন্য কীভাবে দোয়া করব? আপনি তো দোয়া করেছেন, এখন আমিও তো সেখান থেকে হয়ে এসেছি; আমি কী দোয়া করব? তিনি (সা.) বলেন, তুমি বলো,

'মু'মিন ও মুসলমানদের মধ্য থেকে এই গৃহবাসীদের ওপর সালাম এবং আল্লাহ্ তা'লা আমাদের মধ্য থেকে অগ্রগামীদের প্রতি এবং পরবর্তীদের প্রতি অনুগ্রহ করুন। আর আল্লাহ্ যদি চান তবে আমরাও তোমাদের সাথে মিলিত হব।'

(সহীহ মুসলিম, কিতাবুল জানায়েজ, হাদীস-১৬০৭)

তিনি (সা.) এই দোয়াটিও শিখিয়ে দেন। একইভাবে মহানবী (সা.)-এর

যুগ ইমামের বাণী

সেই ব্যক্তি সর্বোত্তম, যে সর্বোত্তম পন্থায় ঋণ পরিশোধ করে। (সহী মুসলিম, কিতাবুল মাসাকাত)

দোয়াপ্রার্থী: Jahan ara Begum, Bhagwangola, Murshdabad

আল্লাহ্ তা'লার প্রতি ভালোবাসার বিষয়ে একটি রেওয়ায়েত এভাবে বর্ণিত হয়েছে: আতা বর্ণনা করেন যে, আমি, হযরত আবদু ল্লাহ্ বিন উমর (রা.) এবং উবায়েদ বিন উমায়ের (রা.) হযরত আয়েশা (রা.)-র কাছে উপস্থিত হই। হযরত ইবনে উমর (রা.) নিবেদন করেন, মহানবী (সা.)-এর জীবনের সবচেয়ে প্রিয় ও বিরল যে বিষয়টি আপনি দেখেছেন তা আমাদের বলুন।

বর্ণনাকারী বলেন, এ কথা শুনে হযরত আয়েশা (রা.) কেঁদে ফেলেন। অতঃপর তিনি বলেন, তাঁর প্রতিটি বিষয়ই ছিল অত্যন্ত আকর্ষণীয় ও বিস্ময়কর। অতঃপর হযরত আয়েশা (রা.) বর্ণনা করেন, একরাতে তিনি (সা.) আমার পালায়আমার কাছে আসেন। যখন তিনি আমার সাথে লেপের নীচে প্রবেশ করেন এবং তাঁর শরীর আমার শরীর স্পর্শ করে তখন তিনি (সা.) বলেন, হে আয়েশা! তুমি যদি আমাকে অনুমতি দাও তবে আজ আমি রাতের বাকি অংশটুকু আমার প্রভুর ইবাদত করতে চাই। আমি বললাম, আমার কাছে আপনার সান্নিধ্য এবং আপনার ইচ্ছা উভয়টিই প্রিয়। আমি আপনার নৈকট্যকেও যেমন ভালোবাসি, তেমনই আপনার ইচ্ছারও সম্মান করি। আপনার সকল ইচ্ছা পূর্ণ হোক-এটিই আমার কাছে সবচেয়ে প্রিয় বিষয় । ঠিক আছে, আপনি যদি ইবাদত করতে চান তবে করুন। এরপর তিনি (সা.) ঘরে রাখা একটি মশকের দিকে এগিয়ে যান এবং ওযু করেন। তিনি খুব বেশি পানি ব্যবহার করেন নি। এরপর তিনি নামাযে দাঁড়ান এবং কুরআন পাঠ আরম্ভ করেন ও কাঁদতে থাকেন। এমনকি আমি দেখলাম, তাঁর অশ্রু তাঁর কাপড়ের কিনারা পর্যন্ত পোঁছে গেছে। এরপর তিনি তাঁর ডান দিকে হেলান দেন এবং ডান হাত গালের নীচে রাখেন আর পুনরায় কাঁদতে থাকেন। এমনকি আমি দেখলাম তাঁর অশ্রু মাটি পর্যন্ত পোঁছে গেছে। হযরত আয়েশা (রা.) বলেন, অতঃপর ফজরের নামাযের সময় হলে হযরত বেলাল (রা.) তাঁকে নামাযের জন্য ডাকতে আসেন। যখন তিনি তাঁকে (সা.) কাঁদতে দেখেন তখন নিবেদন করেন, হে আল্লাহ্র রসূল (সা.)! আপনি কাঁদছেন? অথচ আল্লাহ্ তা'আলা আপনার পূর্বাপর সকল ত্রুটিবিচ্যুতি ক্ষমা করে দিয়েছেন! তিনি (সা.) বলেন, আমি কি একজন কৃতজ্ঞ বান্দা হবো না? (ইখলাকুন নবী ওয়া আদাবুহু, পৃ: ৪০৮-৪০৯)

কৃতজ্ঞতার একটি ঘটনা আমি গত খুতবাতেও বর্ণনা করেছিলাম; এটি সেটিরই অধিকতর বিস্তারিত বর্ণনা। অন্য একটি রেওয়ায়েতে আছে, হযরত আয়েশা (রা.) বলেন, যখন তিনি (সা.) মেঘ অথবা ঝড়ো হাওয়া দেখতেন, তখন তাঁর পবিত্র চেহারায় চিন্তার ছাপ ফুটে উঠত। হযরত আয়েশা (রা.) নিবেদন করেন, হে আল্লাহ্র রসূল (সা.)! মানুষ যখন মেঘ দেখে তখন এই আশায় আনন্দিত হয় যে, এতে বৃষ্টি হবে। কিন্তু আমি দেখি যে, আপনি যখনই মেঘ দেখেন তখন আপনার চেহারায় দুশ্চিন্তা প্রকাশ পায়। তিনি (সা.) বলেন, হে আয়েশা! কোন বিষয়টি আমাকে আশ্বস্ত করবে যে, এ ঝড়ো হাওয়ায় আযাব নিহিত নেই? আমি তো অদৃশ্যের জ্ঞান রাখি না। এখন কোন বিষয়টি আমাকে আশ্বস্ত করবে যে, এতে সেই ঝড়ো হাওয়ার আযাব নেই যা পূর্ববর্তী জাতিগুলোর ওপর এসেছিল? একটি জাতির ওপর আযাব এসেছিল, তারা যখন সেই আযাবকে (মেঘ আকারে) দেখেছিল তখন বলেছিল, এটি এমন মেঘ যা আমাদের ওপর বৃষ্টি বর্ষণ করবে, যেমনটি কুরআন শরীফেও এর উল্লেখ রয়েছে। তাই আমি জানি না-এতে কী আছে আর কী নেই। এই কারণে আল্লাহ্ তা'লার ভয় এবং তাঁর জন্য হৃদয়ে লালিত ভালোবাসার কারণে আমি ভীতত্রস্ত হয়ে পড়ি। (সহীহ বুখারী, ১২তম খণ্ড, পৃ:৬৮-৬৯)

অন্য এক স্থানে হযরত আয়েশা (রা.) এই রেওয়ায়েতটি এভাবে বর্ণনা করেছেন যে, মহানবী (সা.) যখন আকাশে মেঘ দেখতেন তখন অস্থির হয়ে ঘরের ভেতরে-বাইরে যাওয়া-আসা করতেন এবং তাঁর চেহারার রং বদলে যেত। আর যখন বৃষ্টি শুরু হতো তখন তাঁর অস্থিরতা দূর হয়ে যেত, অর্থাৎ স্বাভাবিকভাবে যখন বৃষ্টি বর্ষিত হতো- তখন। হযরত আয়েশা (রা.) তাঁকে এই অবস্থার কারণ জিজ্ঞেস করলে মহানবী (সা.) বলেন, যেমনটি 'আদ' জাতি বলেছিল- এটি সেরকম মেঘ কি না, তা আমি জানি না। সূরা আল-আহকাফের আয়াত অনুযায়ী যারা মেঘকে তাদের উপত্যকার দিকে আসতে দেখে বলেছিল, এই মেঘ আমাদের ওপর বৃষ্টি বর্ষণ করবে; অথচ তা তাদের জন্য আযাব নিয়ে এসেছিল। (সহীহ বুখারী, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ:২৯-৩০)

অতঃপর রেওয়ায়েতে রয়েছে যে, হযরত আবু হুরায়রা (রা) বর্ণনা করেন, রসূলুল্লাহ্ (সা.) এবং তাঁর সাহাবীগণ মেঘ থেকে বর্ষিত প্রথম বৃষ্টির ফোঁটা গ্রহণ করার জন্য নিজেদের মাথা খালি করে দিতেন। রসূলু ল্লাহ্ (সা.) বলতেন: এটি আমাদের মহান প্রভুর পক্ষ থেকে আগত এক তাজা নিয়ামত এবং এটি অত্যন্ত বরকতময়। (কুনযুল উম্মাল, ১ম খণ্ড, ২য় ভাগ, পৃ:২৬৭)

সাধারণ বৃষ্টি বর্ষণের ক্ষেত্রে এটিও তাঁর রীতি ছিল। উরওয়া বিন যুবায়ের (রা.)-র একটি রেওয়াত রয়েছে, তিনি বলেন, আমি হযরত আব্দু ল্লাহ্ বিন আমর ইবনুল আস (রা.)-কে জিজ্ঞেস করলাম, মুশরিকদের পক্ষ থেকে মহানবী (সা.)-কে দেওয়া সবচেয়ে নির্মম আচরণ কী ছিল- তা আমাকে বলুন? তিনি বলেন, একবার মহানবী (সা.) কা'বার হাতিমে নামায পড়ছিলেন, এমন সময় উকবা বিন আবি মু ঈত আসে এবং সে নিজের কাপড় তাঁর (সা.) গলায় পেঁচিয়ে তাঁর গলায় হ্যাঁচকা টান দেওয়া শুরু করে। এরই মাঝে হযরত আবু বকর (রা.) পোঁছে গেলেন এবং তিনি উকবাকে ধাক্কা দেন এবং মহানবী (সা.) থেকে সরিয়ে দেন।

তিনি (রা.) বলেন, তোমরা কি এমন ব্যক্তিকে হত্যা করছ যিনি বলেন- 'আল্লাহ্ আমার প্রভু'। (সহীহ বুখারী, ৭ম খণ্ড, পৃ:৩৩২)

তিনি তো কেবল আল্লাহ্র ভালোবাসায় বিলীন এবং তাঁর ইবাদত করছেন, অথচ তোমরা তাকে হত্যা করতে উদ্যত!

মহানবী (সা.)-এর পুরো জীবন আল্লাহ্র ভালোবাসায় বিলীন ছিল। আল্লাহ্র প্রতি ভালোবাসার এমন দৃশ্য দেখে মক্কার লোকেরা এটাই বলত- اِنَّ مُحَمَّدًا عَشِقَ رَبَّهٗ- অর্থাৎ, মুহাম্মদ (সা.) নিজ প্রভুর প্রেমে পড়েছে।

(আল মুনক্য মিনায যালাল, পৃ: ১০৭)

হযরত আকদাস মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, রসূলুল্লাহ্ (সা.) এক সত্তার প্রেমে পাগলপারা হয়ে গিয়েছিলেন এবং এরপর তা লাভ করেছেন যা পৃথিবীতে কখনো কেউ পায় নি। আল্লাহ্ তা'লার প্রতি তাঁর ভালোবাসা এত বেশি ছিল যে, সাধারণ মানু ষজনও বলত, اِنَّ مُحَمَّدًا عَشِقَ رَبَّهٗ- অর্থাৎ, মুহাম্মদ (সা.) নিজ প্রভুর প্রেমে পড়েছে।" (মালফুযাত, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ: ৬)

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) অপর এক স্থানে বলেন,

সাহাবা (রাযিআল্লাহু আনহুম) সেই সত্যবাদী পুরুষের চেহারা দেখেছিলেন, যাঁর আল্লাহ্র প্রেমিক হওয়ার সাক্ষ্য অবলীলায় কুরাইশের কাফিরদের মুখ থেকে বের হয়েছিল; দৈনন্দিন ইবাদত ও প্রেমময় সিজদা এবং আনুগত্যে বিলীনতা, পরম ভালোবাসা ও প্রেমের উজ্জ্বল ছাপ চেহারায় প্রত্যক্ষ করে এবং সেই পবিত্র চেহারার ওপর ঐশী জ্যোতি বর্ষিত হওয়া প্রত্যক্ষ করে তারা বলত, اِنَّ مُحَمَّدًا عَشِقَ رَبَّهٗ- -অর্থাৎ, মুহাম্মদ (সা.) নিজ প্রভুর প্রেমে পড়েছে।

অতঃপর সাহাবীরা শুধু সেই সততা, ভালোবাসা ও নিষ্ঠাই দেখেন নি, বরং আমাদের নেতা মুহাম্মদ (সা.)-এর হৃদয় থেকে নদীর ন্যায় প্রবাহমান সেই ভালোবাসার বিপরীতে আল্লাহ্ তা'লার ভালোবাসাকেও অসাধারণ সমর্থনরূপে প্রত্যক্ষ করেছেন। তখন তারা জানতে পারেন যে, আল্লাহ্ আছেন; আর তাদের হৃদয় বলে ওঠে, সেই আল্লাহ্ এই মহান ব্যক্তির সাথে আছেন। তারা এত বিপুল পরিমাণে ঐশী বিস্ময়কর ঘটনাবলি প্রত্যক্ষ করেছেন এবং এত পরিমাণে ঐশী নিদর্শন প্রত্যক্ষ করেছেন যে, তাদের এই ব্যাপারে বিন্দুমাত্র সন্দেহ অবশিষ্ট থাকে নি যে, প্রকৃতপক্ষে একজন মহান সত্তা বিদ্যমান রয়েছেন যাঁ র নাম আল্লাহ্, যাঁর নিয়ন্ত্রণে রয়েছে প্রতিটি বিষয়, আর যাঁ র জন্য অসম্ভব বলে কিছু নেই। এজন্যই তারা সততা ও নিষ্ঠার সেই কাজ করেছেন এবং সেরকম রক্ত পানি করা পরিশ্রম করেছেন যা কখনো মানু ষের জন্য করা সম্ভব নয়, যতক্ষণ পর্যন্ত তার সমস্ত সন্দেহ ও সংশয় দূর হয়ে না যায়। তারা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করেছেন যে, মানুষ যদি ইসলাম ধর্মে প্রবেশ করে এবং তাঁর পবিত্র রসূ লকে (সা.) মনেপ্রাণে অনুসরণ করে, তবে এতেই সেই পবিত্র সত্তা সন্তুষ্ট হন। এই পরিপূর্ণ বিশ্বাস অর্জনের পর তারা আনুগত্যের যে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন এবং আনুগত্যের যে আবেগ নিয়ে তারা কাজ করেছেন এবং যেভাবে নিজেদের প্রাণ তাদের মহান পথপ্রদর্শকের সম্মুখে উপস্থাপন করেছেন।"

(শাহাদাতুল কুরআন, রূহানী খাযায়েন, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ: ৩৪৬)

অভিজ্ঞতা না হওয়া পর্যন্ত তেমনটি করা সম্ভব নয়।

হযরত আলী (রা.)-র বর্ণনা করেন, আমি রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর কাছে তাঁর (জীবন) পদ্ধতির ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলাম, আপনার পদ্ধতি কী?

তিনি (সা.) বলেন, আমার মূলধন হলো মা'রেফত। অর্থাৎ, আপনার জীবনের মূলমন্ত্র কী? তিনি (সা.) বলেন, মা'রেফত (তথা তত্ত্বজ্ঞান) হলো আমার মূলধন আর বিবেকবুদ্ধি আমার ধর্মের মূল। [আল্লাহ্ তা'লা আমাকে মা'রেফত দান করেছেন, এটি আমার মূলধন এবং আমার সম্পদ। আল্লাহ্ তা'লা আমাকে বিবেকবুদ্ধি দিয়েছেন আর আমি তা আল্লাহ্ তা'লার ভালোবাসায় ব্যবহার করি এবং তাঁর নির্দেশিত মূলনীতির ওপর পরিচালিত হয়ে ব্যবহার করি।] এটি আমার ধর্মের মূল ও ভিত্তি,এবং আল্লাহ্ তা'লার ভালোবাসাই আমার জীবনের মূলধন ভিত্তি। আল্লাহ্র পথে অগ্রগামী হওয়ার উদ্দীপনা আমার বাহন। [আল্লাহ্ র রাস্তায় এবং তাঁর ভালোবাসায় ক্রমাগত উন্নতি লাভের আগ্রহই হলো আমার বাহন; এতে আরোহণ করে আমি ক্রমাগত উন্নতি করে চলেছি এবং চেষ্টাপ্রচেষ্টা করে যাচ্ছি।] আর আল্লাহ্ তা'লার যিকর আমার বন্ধু ও সমব্যথী। [কে আমার বন্ধু? কে আমার সহমর্মী আর আমাকে সান্ত্বনাদাতা? তা কেবলমাত্র আল্লাহ্ তা'লার স্মরণ, তাঁর যিকর এবং দোয়া।] আল্লাহ্ র ওপর আস্থা আমার ধনভাণ্ডার। [আমি কেবল তাঁর প্রতিই আস্থা এবং ভরসা করি আর এটিই আমার ধনভাণ্ডার।] তুমি যেহেতু আমার পদ্ধতি সম্বন্ধে জানতে চাইছ তাই স্মরণ রেখো! দুঃখকষ্ট আমার জীবনসঙ্গী। [আমি যদি কোনো দুঃখ বা কষ্ট পাই তবে তা আমার সাথি এবং জীবনের অংশ, আমি এসবের কোনো

যুগ খলীফার বাণী

জাগতিক কামন-বাসনা শিরকের অন্তর্ভুক্ত। এটি এড়িয়ে চলা আবশ্যক।

(খুতবা জুমআ, ২৪ শে মে, ২০১৯)

দোয়াপ্রার্থী: Abdus Salam Master, Nararvita (Assam)

পরোয়া করি না। কেননা আল্লাহ্ তা'লা আমার সাথেই আছেন।]

অতঃপর তিনি (সা.) বলেন, জ্ঞান হলো আমার অস্ত্র। আল্লাহ্ তা'লা জ্ঞানার্জনের নির্দেশ দিয়েছেন, কেননা জ্ঞানার্জনের মাধ্যমে মেধা প্রখর হয় এবং আল্লাহ্ তা'লার তত্ত্বজ্ঞান (মা'রেফত) অধিক অর্জিত হয় আর আমাকে আল্লাহ্ তা'লা জ্ঞানশেখান; আর আল্লাহ্ প্রদত্ত জ্ঞানের চেয়ে বড়ো অস্ত্র আর কী হতে পারে! তিনি (সা.) বলেন, এটিই আমার অস্ত্র যার সাহায্যে আমি উন্নতি করছি। [জাগতিক জ্ঞানের ক্ষেত্রে আপনারা লক্ষ্যকরেছেন, যেমনটি আমি ইতোপূর্বে খুতবাসমূহে যুদ্ধের ঘটনাবলি বর্ণনা করেছি; আল্লাহ্ তা'লা তাঁকে অভাবনীয়ভাবে জ্ঞান দান করেছেন যার ফলশ্রুতিতে তিনি (সা.) সর্বোত্তম রণকৌশল ও পরিকল্পনা গ্রহণ করতে পেরেছেন। অনুরূপভাবে, অসংখ্য আধ্যাত্মিক জ্ঞানেও তিনি (সা.) পরিপূর্ণ ছিলেন যার কোনো অন্ত নেই। আর এই বিষয়টি সবার জানা, সবার সামনেই স্পষ্ট।]অতঃপর তিনি (সা.) বলেন, ধৈর্য হলো আমার চাদর। [অর্থাৎ, আমার চাদর ও পোশাক হলো ধৈর্য।] আর আমার মালে গনিমত হলো আল্লাহ্র সন্তুষ্টিতে সন্তুষ্ট থাকা। [আমি আল্লাহ্র ইচ্ছায় সন্তুষ্ট আর এটাই আমার মালে গনিমত।] দারিদ্র্য আমার গর্ব আর বাহ্যিক দারিদ্র্য বা আর্থিক অসচ্ছলতাই হলো আমার অহংকার। [দরিদ্রতা সত্ত্বে ও আল্লাহ্ তা'লা আমাকে অগণিত কল্যাণ দান করার কারণে আমি গর্ববোধ করি।] সংসারবিরাগ ও খোদাভীতি হলো আমার কৌশল আর আমি এটিই আত্মস্থ করার চেষ্টা করি। বিশ্বাস হলো আমার শক্তি। [আল্লাহ্ তা'লার ওপর আমার পরিপূর্ণ বিশ্বাস রয়েছে আর এটিই আমার শক্তির উৎস।] সত্যবাদিতা আমার সুপারিশকারী, আমি কখনো মিথ্যা কথা বলি নি, আর সত্যবাদিতা আমার জন্য সুপারিশের মাধ্যম। আনুগত্য আমার জন্য যথেষ্ট। আমি আল্লাহ্ তা'লার সকল আদেশ পরিপূর্ণরূপে আনুগত্যের সাথে পালনকারী। জিহাদ করা আমার আদর্শ ; [দৈহিক জিহাদ হোক বা আল্লাহ্ তা'লার পথে আধ্যাত্মিক জিহাদ হোক অথবা আল্লাহ্র সৃষ্টজীবের অধিকার প্রদানের জিহাদ হোক– এটিই আমার আদর্শ ;] নামায হলো আমার চোখের স্নিগ্ধতা। [এ সবকিছু লাভ করা সত্ত্বেও আমার চোখের প্রকৃত স্নিগ্ধতা হলো নামায। আল্লাহ্ তা'লার নৈকট্য অর্জন করতে হবে,তাঁর ইবাদত করতে হবে, তাঁর প্রতি ভালোবাসা প্রকাশ করতে হবে।]

অপর একটি হাদীসানুসারে তিনি (সা.) বলেছেন, আমার অন্তরের (সুমিষ্ট) ফল হলো আল্লাহ্র স্মরণ আর আমার আকাঙ্ক্ষা ও অভিষ্ট আমার প্রভুর মাঝেই সীমাবদ্ধ। (আশ শাফা বি তারিফ হুকুকিল মুস্তফা, প্রণেতা কাজি আয়াজ, পৃ: ১৯১)

সুতরাং মহানবী (সা.)-এর জীবনাদর্শ এবং আল্লাহ্ তা'লার প্রতি তাঁর ভালোবাসার দৃষ্টান্ত এমনই ছিল যার কতিপয় দৃষ্টান্ত আমি উপস্থাপন করেছি। এই দৃষ্টান্তের কল্যাণেই সাহাবীদের মাঝে একটি বিপ্লব সৃষ্টি হয়েছিল আর তারা সেই পদমর্যাদা লাভ করেছেন যার ধারণাও ইতোপূর্বে করা সম্ভব ছিল না; যেমনটি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেছেন, যা আমি আগেও পড়েছিলাম। এটাই সেই পূর্ণাঙ্গীন-পরিপূর্ণ শিক্ষা, যা তাঁর একনিষ্ঠ দাস হযরত মসীহ্মওউদ (আ.) নিজেও গ্রহণ করেছিলেন।

তিনি (আ.) এক স্থানে বলেন, আল্লাহ্ তা'লা তাঁকেও মহানবী (সা.)-এর পরিপূর্ণ অনুসরণের ফলেই এ নিয়ামত দান করেছেন।

তিনি (আ.) বলেন, আমাকে স্বপ্নে দুবার পাঞ্জাবী ভাষায় দুটি পঙ্ক্তি বলা হয়েছে। একটিতে বলা হয়েছে, 'জে তু মেরা হো রহেঁ, সব জগ তেরা হো।[অর্থাৎ, তুমি যদি আমার হও তবে সমগ্র জগৎ তোমার হয়ে যাবে। (অনুবাদক)]আরেকবার আমি দেখি, একটি বিস্তৃত ময়দান। সেখানে একজন 'মজযুব' (তথা যার অন্তর আল্লাহ্র ভালোবাসার উন্মাদনায় পরিপূর্ণ) আমার দিকে এগিয়ে আসছে। আমি তার নিকটবর্তী হলে সে এই পঙ্ক্তি পাঠ করল, *'ইশকে ইলাহি ওয়াসসে মুহ পর ওলীয়াঁ এহ নিশানী।' (তাযকেরা, পৃ: ৪৩৯-৪৪০)*

অর্থাৎ, অলিদের পরিচয় হলো, তাদের মুখমণ্ডলে আল্লাহ্ র ভালোবাসার দৃশ্যমান হয়ে থাকে। এর অর্থ ছিল, সে আমাকে দেখে একথা বলেছিল, কারণ সে (আমার মাঝে) খোদাপ্রেম দেখেছিল, নূর দেখেছিল।

তিনি (আ.) এক স্থানে এ-ও বলেন, আমি যা কিছু অর্জন করেছি তা সবই মহানবী (সা.)-এর অনুসরণের ফলেই লাভ হয়েছে।

(সূত্র: হাকীকাতুল ওহী, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড-২২, পৃ: ৬৪)

এটাই ছিল তাঁর আদর্শ আর এ কারণেই তিনি জামা'ত প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

আজ আমরা যে দাবি করি– আমরা হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর প্রকৃত অনুসারী, আর আমরাই তাঁর (সা.) একনিষ্ঠ সেবক হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর হাতে বয়আত করে এই অঙ্গীকার নবায়ন করেছি যে, ভবিষ্যতে আমরা আমাদের জীবন আল্লাহ্ তা'লার নির্দেশাবলি অনুযায়ী গড়ে তোলার চেষ্টা করব। তাই আমাদেরও এদিকেমনোযোগ দিতে হবে যে, আমাদের প্র তিটি কাজ কেবল আল্লাহ্ তা'লার জন্যই করতে হবে এবং তাঁর ভালোবাসা অর্জনের লক্ষ্যে আরো বেশি সচেষ্ট হতে হবে। আমরা যখন এভাবে আমল করতে সক্ষম হবো, তখনই কেবল আল্লাহ্ তা'লার অনুগ্রহের ভাগীদার হতে পারব, মহানবী (সা.)-এর সত্যিকার উম্মত হবার প্রকৃত দায়িত্ব পালনে সক্ষম হবো, হযরত মসীহ্মওউদ (আ.)-এর হাতে বয়আতের কারণে যে দায়িত্ব বর্তায় তা পালন করতে পারব এবং তাঁর সত্যিকার অনুসারীদের মধ্যে পরিগণ্য হবো।

আল্লাহ্ তা'লা আমাদের এ তৌফিক দান করুন।

বর্তমানে পাকিস্তানের আহমদীদের জন্য বিশেষভাবে দোয়া করুন। সেখানে মুবারক সানী সাহেবের বিরুদ্ধে একটি মামলা চলমান রয়েছে; দুদিন পূর্বে সেশন জজ তাকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দিয়েছে। অভিযোগ হলো, তার কাছে পবিত্র কুরআন ছিল; তিনি তা পড়তেন এবং অন্যদেরও পড়াতেন। এটা হলো সেখানকার আদালতগুলোর অবস্থা! তাদের অবস্থার আর কী-ইবা উন্নতি আশা করা যায়! এই রায়ের বিষয়ে তো অআহমদীরাও লিখেছে, এটা কেমন হাস্যকর রায়! অবশ্য কিছু মোল্লা-মৌলভীর পক্ষ থেকে সাধারণভাবে এই রায়কে সাধুবাদও জানানো হচ্ছে এবং বিচারকের খুব প্রশংসা করা হচ্ছে। কিন্তু ন্যায়পরায়ণ লেখকেরা লিখেছেন, আর তাদের কেউ কেউ বিদ্রূপাত্মক সুরেই লিখেছেন– এত বড়ো অপরাধ! বাড়িতে পবিত্র কুরআন রেখেছে আর সেটা পড়ে এবং শিশুদেরও পড়ায়! এটা হলো তথাকথিত এসব আলেম ও তাদের সাঙ্গপাঙ্গদের অবস্থা। সরকার ও প্রশাসনও এসব মোল্লাদের পেছনে চলে কিছু কিছু স্থানে এমনটাই করছে। যাহোক, আমরা দোয়া করি– আল্লাহ্ তা'লা যেন অচিরেই তাদের পাকড়াও করার ব্যবস্থা করেন। আল্লাহ্ তা'লার শাস্তি শীঘ্রই তাদের ধৃত করবে, ইনশাআল্লাহ্ , আর এর লক্ষণও দেখা যাচ্ছে। তবে আমাদের দোয়ায় শৈথিল্য বা কর্ম ও যথাযথভাবে ইবাদত না করার কারণে যেন এতে বিলম্ব না ঘটে– এ নিয়ে আমাদের সতর্ক থাকা উচিত; যেভাবে মহানবী (সা.)-ও কখনো কখনো মেঘ দেখলে ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে দোয়া করতেন। সুতরাং দোয়ার প্রতি খুব বেশি মনোযোগ নিবদ্ধ করা প্রয়োজন।

একইসাথে বিশ্বের অন্যান্য নির্যাতিত মানুষের জন্যও দোয়া করুন। আল্লাহ্ তা'লা সর্বত্র সবাইকে নিরাপত্তা দান করুন এবং সব ধরনেরনৈরাজ্য ও বিশৃঙ্খলা থেকে রক্ষা করুন।

নামাযের পর আমি দুই ব্যক্তির গায়েবানা জানাযা পড়াবো। দুইজনের স্মৃতিচারণ রয়েছে। প্রথমজন হলেন মওলানা জালালুদ্দীন নাইয়ার সাহেব। তিনি কাদিয়ানের সদর আঞ্জুমানে আহমদীয়া এবং সদর মজলিস তাহরীকে জাদীদের প্রাক্তন সদর ছিলেন। সম্প্রতি তিনি মৃত্যুবরণ করেছেন। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। তার পিতা শ্রদ্ধেয় এইচ. হুসাইন সাহেব বিশ্বযুদ্ধের সময় সেনাবাহিনীতে ক্লার্ক হিসেবে চাকরি করতেন। সেই সময় বসরাতে ১৯২২ সালে আহমদীয়াত গ্রহণ করেন এবং কেরালা থেকে প্রকাশিত জামা'তী পত্রিকা 'সাত্তিয়া দোতান'-এর সম্পাদক নিযুক্ত হন। তিনি কেরালার অধিবাসী ছিলেন। সেনাবাহিনীর চাকরি শেষে সেখানে ফিরে আসেন। মরহুমের পিতা শ্রদ্ধেয় এইচ. হুসাইন সাহেব ১৯৫০ সালে হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.)-র কাদিয়ানে বসতি গড়ার ডাকে সাড়া দিয়ে পুরো পরিবারসহ স্থায়ীভাবে কাদিয়ান এসে যান। তবে বছরখানেকের মাঝে তার মৃত্যু হয়। মওলানা জালালুদ্দীন নাইয়ার সাহেবের মাতা শ্রদ্ধেয়া যুবায়দা সুলতানা সাহেবার পরবর্তীতে সেখানে দরবেশ চৌধু রী আব্দুল হক সাহেবের সাথে দ্বিতীয় বিয়ে হয়। তিনি (দরবেশ সাহেব) নাইয়ার সাহেবের ভাই-বোনকে নিজের দায়িত্বে নিয়ে নেন। জালালুদ্দীন নাইয়ার সাহেব প্রাথমিক শিক্ষা কাদিয়ানেগ্রহণ করেন। ১৯৬৩ সালে তিনি মৌল ভী ফাযেল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। এরপর আঞ্জুমানে ইন্সপেক্টর বাইতুল মাল হিসেবে তার প্রথম পদায়ন হয়। দীর্ঘ কাল তিনি এই পদে সেবা প্রদান করেন। ভারতের সকল জামা'তে তিনি সফর করতেন আর এর মাধ্যমে অনেক পরিশ্রম করে আন্তরিকতার সাথে জামা'তের সদস্যদেরকে চাঁদার ব্যবস্থাপনায় অন্তর্ভুক্ত করেন। একারণেই তার সাথে পুরো ভারতের জামা'তগুলোর সদস্যদের সাথে ব্যক্তিগত সম্পর্কও ছিল। ৬৩ বছর পর্যন্ত মরহুম জামা'তের সেবা করার সৌভাগ্য লাভ করেন। এই মেয়াদকালে তিনি ইন্সপেক্টর বাইতুল মাল আমদ, এরপর অডিটর, মুহাসিব আর এরপর দীর্ঘ সময় নাযের বাইতুল মাল আমদ হিসেবে সেবা প্রদানের সুযোগ লাভ করেন। আমি যেভাবে বলেছি, তিনি সাত বছর সদর আঞ্জুমানে আহমদীয়া, কাদিয়ানের সদর ছিলেন। এরপর যতদিন স্বাস্থ্য সচল থেকেছে তিনি সদর মজলিসে তাহরীকে জাদীদেরও সদর ছিলেন। অনুরূপভাবে

যুগ খলীফার বাণী

খিলাফত এবং জামাতের সঙ্গে যারা সম্পর্ক স্থাপন করে, আল্লাহ তা'লা তাদের পথ-প্রদর্শন করেন।

-খুতবা জমা ২৪ মে ২০১৯

দোয়াপ্রার্থী: **Noor Jahan Begum, Kolkata**

যুগ ইমামের বাণী

সেই সময় দূর নয় বরং অতি নিকটেই যেদিন তোমরা আকাশ থেকে ফিরিশতাদের ফৌজ এশিয়া ,ইউরোপ ও আমেরিকার মানুষের মনে অবতীর্ণ হতে দেখবে। (ফতেহ ইসলাম, রূ-খা, খণ্ড-৩, পৃ: ১২)

দোয়াপ্রার্থী: **Sayen Mir and Family, Kogram, Nalhati (Birbhum)**

হযরত মুসলেহ মওউদ সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণীর পটভূমিকা

সালিক আহমদ নাইক, মুরুব্বী সিলসিলা কাদিয়ান

এই অশান্ত ও পরীক্ষাসঙ্কুল যুগে আল্লাহ তা'আলা ইসলাম এবং হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সা.)-এর সত্যতার প্রকাশের জন্য হযরত আকদাস মসীহ মওউদ (আলাইহিস সালাম)-কে অসংখ্য মহিমান্বিত নিদর্শন দান করেন। এই নিদর্শনগুলোর মধ্যে অন্যতম সর্বাধিক মর্যাদাপূর্ণ, ব্যতিক্রমধর্মী ও মহান নিদর্শন হলো মুসলেহ মওউদ (প্রতিশ্রুত সংস্কারক) সম্পর্কিত ভবিষ্যদ্বাণী। এই ভবিষ্যদ্বাণী এমন এক সময়ে করা হয়েছিল, যখন ইসলাম যৌক্তিক ও আকীদাগত প্রবল আক্রমণের সামনে অসহায় দাঁড়িয়ে ছিল এবং মুসলিম উম্মাহ দুর্বলতা ও দলাদলির দুর্বিপাকে নিমজ্জিত ছিল। এই ভবিষ্যদ্বাণীর পটভূমি, এর ব্যতিক্রমী গুরুত্ব ও মহিমা এবং এতে যে মহান ব্যক্তিত্বের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে-এসব বিষয়ে একটি পূর্ণাঙ্গ ও সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা হযরত আকদাস মসীহ মওউদ (আলাইহিস সালাম)-এর নিজের লেখনিতে সম্পূর্ণ স্পষ্টতার সঙ্গে বিদ্যমান।

হযরত মির্জা গুলাম আহমদ কাদিয়ানী (আলাইহিস সালাম)-এর যুগান্তকারী রচনা বারাহিনে আহমদিয়্যা প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই মুসলিম বিশ্বে আনন্দ ও প্রশান্তির এক ঢেউ বয়ে যায়, কারণ এই গ্রন্থটি ইসলামের সত্যতার পক্ষে এক শক্তিশালী প্রতিরক্ষা ছিল। একই সঙ্গে ইসলামের বিরোধীদের মহলে তীব্র উদ্বেগ ও আলোড়ন সৃষ্টি হয়। এই ঐতিহাসিক গ্রন্থেই হযরত আকদাস (আলাইহিস সালাম) সমগ্র বিশ্বের প্রতি সম্বোধন করে এক মহান সুসংবাদ ঘোষণা করেন:

"সুতরাং পরাক্রমশালী প্রভু এই যুগে এই অধম বান্দাকে সৃষ্টি করে, শত শত আসমানী নিদর্শন, অদৃশ্য জগতের অলৌকিকতা, আত্মিক জ্ঞান ও বাস্তবতা দান করে এবং শত শত চূড়ান্ত বুদ্ধিবৃত্তিক প্রমাণের মাধ্যমে জ্ঞান প্রদান করে এই ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন- যাতে সত্য কুরআনিক শিক্ষাসমূহ প্রত্যেক জাতি ও প্রত্যেক দেশে প্রচারিত ও প্রতিষ্ঠিত হয় এবং তাদের ওপর তাঁর প্রমাণ পূর্ণ হয় এবং প্রত্যেক বিরোধী নিজেই তার পরাজয় ও অসহায়তার সাক্ষী হয়ে যায়।"

(বারাহীনে আহমদিয়্যা, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড ১, পৃ. ৫৯৬-৫৯৭, প্রান্তটীকা)

হযরত আকদাস (আলাইহিস সালাম) এই সুসংবাদের ঘোষণা কেবল ভারতের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখেননি; বরং তাঁর পত্রালাপের মাধ্যমে ভারতের বাইরেও এই বার্তা পৌঁছে দেন। নিজের সামর্থ্য অনুযায়ী যেখানে সম্ভব হয়েছে, সেখানে তিনি ইসলামের বিরোধীদের বিরুদ্ধে চূড়ান্ত প্রমাণ প্রতিষ্ঠা করেছেন।

এভাবে যখন ইসলামের সত্যতার জীবন্ত ও দীপ্তিমান নিদর্শনসমূহের আলোচনা বিশ্বজুড়ে ছড়িয়ে পড়তে শুরু করে এবং সকল বিরোধীকে প্রকাশ্যে এসব নিদর্শন প্রত্যক্ষ করার আহ্বান জানানো হচ্ছিল, ঠিক সেই সময়ে ১৮৮৫ সালে কাদিয়ানের কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তি ও অন্যান্য হিন্দু নেতার পক্ষ থেকে হযরত আকদাস (আলাইহিস সালাম)-এর নিকট একটি পত্র পৌঁছে। সেই পত্রে এই দাবি উত্থাপন করা হয়:

"যেহেতু আপনি লন্ডন ও আমেরিকা পর্যন্ত রেজিস্ট্রি চিঠি পাঠিয়েছেন যে, যে- কেউ সত্য অনুসন্ধানকারী হয়ে এক বছর আপনার কাছে কাদিয়ানে এসে অবস্থান করবে, আল্লাহ তা'আলা তাকে ইসলামের সত্যতা প্রমাণে এমন নিদর্শন অবশ্যই দেখাবেন যা মানবীয় শক্তির উর্ধ্বে- সেহেতু আমরা যারা আপনার প্রতিবেশী ও সহনগরবাসী, তারা লন্ডন ও আমেরিকার লোকদের চেয়ে অধিক অধিকারী। তবে আমরা এমন নিদর্শনেই সন্তুষ্ট, যাতে আসমান-যমিন উল্টে দেওয়ার প্রয়োজন নেই এবং প্রাকৃতিক নিয়ম ভাঙারও দরকার নেই। হ্যাঁ, আমরা অবশ্যই এমন নিদর্শন চাই যা মানবীয় শক্তির উর্ধ্বে, যার দ্বারা বোঝা যায় যে সেই সত্য ও পবিত্র পরমেশ্বর আপনার ধার্মিকতা ও ধর্মীয় সততার কারণে নিখাদ প্রেম ও কৃপা থেকে আপনার দোয়া কবুল করেন; ঘটনার পূর্বেই তার গ্রহণযোগ্যতার সংবাদ দেন; অথবা তাঁর বিশেষ কিছু গোপন রহস্য আপনাকে অবহিত করেন এবং ভবিষ্যদ্বাণীরূপে সেই গোপন বিষয়গুলোর খবর দেন; অথবা আপনাকে এমন আশ্চর্য উপায়ে সাহায্য ও সমর্থন করেন, যেভাবে তিনি আদিকাল থেকে তাঁর নির্বাচিত, নৈকট্যভাজন, ভক্ত ও বিশেষ বান্দাদের সঙ্গে করে আসছেন।আর নিদর্শন প্রদর্শনের জন্য নির্ধারিত বছর গণনা করা হবে সেপ্টেম্বর ১৮৮৫-এর শুরু থেকে এবং তার সমাপ্তি হবে সেপ্টেম্বর ১৮৮৬-এর শেষে।"

(মাজমু'আ ইশতেহারাত, খণ্ড ১, পৃ. ৯২-৯৪)

এই পত্রের শেষে দশজন হিন্দু বিশিষ্টজনের নাম লিপিবদ্ধ ছিল। পত্রটি প্রাপ্ত হলে হযরত আকদাস (আলাইহিস সালাম) উত্তরে লিখেন:

"হে অলৌকিক নিদর্শন প্রত্যক্ষ করার আবেদনকারীগণ। আপনারা যে অনুগ্রহপত্রে আসমানী নিদর্শন দেখার আবেদন করেছেন, তা আমার নিকট পৌঁছেছে। যেহেতু এই পত্রটি সম্পূর্ণ ন্যায় ও সত্য অনুসন্ধানের ওপর ভিত্তি করে রচিত এবং এটি পূর্ণ দশজন সত্য অন্বেষণকারীর পক্ষ থেকে প্রেরিত, সেহেতু আমি সম্পূর্ণ কৃতজ্ঞতার সঙ্গে এর বিষয়বস্তু গ্রহণ করছি এবং আপনাদের সঙ্গে অঙ্গীকার করছি যে, যদি আপনারা আপনাদের পত্রে কৃত অঙ্গীকারসমূহ পালন করেন, তবে সর্বশক্তিমান ও মহিমান্বিত আল্লাহর সমর্থন ও সাহায্যে এক বছরের মধ্যেই আপনাদেরকে এমন একটি নিদর্শন অবশ্যই দেখানো হবে, যা মানবীয় শক্তির উর্ধ্বে। আপনাদের ন্যায়সঙ্গত ও সুবিচারপূর্ণ পত্র পড়ে এই অধম অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছে।"

(মাজমু'আ ইশতেহারাত, খণ্ড ১, পৃ. ৯৫)

হযরত আকদাস (আলাইহিস সালাম)-এর এই ইশতেহার থেকে স্পষ্ট যে, ইসলামের সত্যতার পক্ষে নিদর্শন প্রকাশের দাবিসম্পন্ন সেই হিন্দু ভদ্রলোকদের পত্রে তিনি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হয়েছিলেন। অতঃফর তিনি পূর্ণ মনোযোগ ও দৃঢ় বিশ্বাসের সঙ্গে সেই এক ও অদ্বিতীয় আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তন করেন-যাঁর নিশ্চিত সমর্থন ও সাহায্যের প্রতিশ্রুতির ওপর ভর করেই তিনি এই যুগে ইসলামের সত্যতা ঘোষণা করেছিলেন।

তিনি গভীর আকুতি, বিনয় ও আন্তরিকতার সঙ্গে এই নিদর্শনের জন্য দোয়া করতে থাকেন। দোয়ার সময় কোনো প্রকার ব্যাঘাত থেকে রক্ষা পেতে এবং অধিক একাগ্রতা ও নিমগ্নতা অর্জনের লক্ষ্যে তিনি নির্জনবাস অবলম্বনের সিদ্ধান্ত নেন। এই উদ্দেশ্যে তিনি নিজের ঘরবাড়ি ও আত্মীয়স্বজন থেকে পৃথক হয়ে হোশিয়ারপুরে গমন করেন এবং সেখানে পূর্ণ ত্যাগ, সম্পর্কচ্ছেদ ও নিষ্ঠার সঙ্গে আল্লাহ তা'আলার দরবারে সিজদাবনত হয়ে দোয়ায় নিমগ্ন থাকেন।

পরম দয়ালু ও করুণাময় আল্লাহ তাঁর এই হৃদয়বিদারক আকুতি, ব্যাকুলতা এবং ইসলামের সত্যতার জন্য অস্থির উদ্বেগ কবুল করেন এবং তাঁকে সান্ত্বনা দিয়ে দোয়াগুলো গ্রহণের মর্যাদা দান করেন, পাশাপাশি এক মহান নিদর্শনের সুসংবাদ প্রদান করেন। এই সুসংবাদ ঘোষণা করতে গিয়ে হযরত আকদাস (আলাইহিস সালাম) ২০ ফেব্রুয়ারি ১৮৮৬ তারিখের ইশতেহারে বলেন:

"আমি তোমাকে রহমতের একটি নিদর্শন দান করছি, ঠিক সেই অনুযায়ী যা তুমি আমার কাছে চেয়েছিলে। সুতরাং আমি তোমার আকুতি শুনেছি এবং আমার রহমতের মাধ্যমে তোমার দোয়াগুলোকে গ্রহণযোগ্যতার মর্যাদা দিয়েছি এবং তোমার সফর-হোশিয়ারপুর ও লুধিয়ানার সফর-তোমার জন্য বরকতময় করেছি। অতএব তোমাকে ক্ষমতা, রহমত ও নৈকট্যের একটি নিদর্শন দেওয়া হলো; অনুগ্রহ ও দয়ার একটি নিদর্শন তোমাকে দান করা হলো; এবং বিজয় ও সাফল্যের চাবিকাঠি তোমাকে দেওয়া হলো। হে বিজয়ী, তোমার ওপর শান্তি বর্ষিত হোক! আল্লাহ এ কথা বলেছেন, যাতে জীবন প্রত্যাশীরা মৃত্যুর কবল থেকে মুক্তি পায় এবং যারা কবরসমূহে চাপা পড়ে আছে তারা বেরিয়ে আসে; এবং যাতে ইসলামের ধর্মের মর্যাদা ও আল্লাহর কালামের স্থান মানুষের সামনে প্রকাশিত হয়; এবং যাতে সত্য তার সকল বরকতসহ আগমন করে এবং মিথ্যা তার সকল দুর্ভাগ্যসহ পলায়ন করে; এবং যাতে মানুষ বুঝতে পারে যে আমি সর্বশক্তিমান-যা ইচ্ছা করি তা-ই করি; এবং যাতে তারা বিশ্বাস করে যে আমি তোমার সঙ্গে আছি; এবং যাতে যারা আল্লাহর অস্তিত্বে বিশ্বাস করে না এবং আল্লাহ, তাঁর ধর্ম, তাঁর কিতাব ও তাঁর পবিত্র রাসূল মুহাম্মদ মুস্তফাকে অস্বীকার ও প্রত্যাখ্যানের দৃষ্টিতে দেখে, তারা একটি স্পষ্ট নিদর্শন লাভ করে এবং অপরাধীদের পথ প্রকাশিত হয়।

সুতরাং আনন্দিত হও, কারণ তোমাকে এক সুদর্শন ও পবিত্র পুত্র দান করা হবে; এক পবিত্র সন্তান তুমি পাবে। সেই পুত্র তোমারই বংশধারা থেকে, তোমারই সন্তান ও বংশের হবে। এক সুন্দর ও পবিত্র পুত্র তোমার অতিথি হয়ে আসছে; তার নাম ইমানুয়েল এবং বশীরও। তাকে পবিত্র রূহ প্রদান করা হয়েছে এবং সে অপবিত্রতা থেকে মুক্ত; সে আল্লাহর নূর। ধন্য সে, যে আসমান থেকে আগমন করে; তার আগমনের সঙ্গে এমন এক অনুগ্রহ আসবে যা তার সঙ্গে থাকবে। সে মর্যাদা, মহিমা ও সমৃদ্ধির অধিকারী হবে। সে পৃথিবীতে আগমন করবে এবং তার মসীহি আত্মা ও রূহুল কুদুস এর বরকতে বহু লোককে ব্যাধি থেকে মুক্ত করবে। সে আল্লাহর কালাম, কারণ আল্লাহর কৃপা ও আত্মাভিমান তাকে প্রশংসার বাক্যসহ প্রেরণ করেছে। সে অত্যন্ত তীক্ষ্ণবুদ্ধি ও প্রজ্ঞাবান হবে, হৃদয়ে কোমল হবে এবং বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ জ্ঞান দ্বারা পূর্ণ করা হবে। সে তিনকে চার করবে (এর অর্থ তখনো স্পষ্ট হয়নি)। সোমবার-শুভ সোমবার। প্রিয়, সম্মানিত ও মর্যাদাবান পুত্র। প্রথম ও

মহানবী (সা.)-এর বাণী

সদকা কখনও কারো সম্পদ হ্রাস করে নি আর আল্লাহ্ তা'লা ক্ষমা দানের কারণে বান্দার সম্মান বৃদ্ধিই করে থাকেন।

(সহী মুসলিম, কিতাবুর বির ওয়াসসিলাহ ওয়াল আদাব)

দোয়াপ্রার্থী: Shujauddin and family, Barisha (Kolkata)

শেষ বিকাশ, সত্যের বিকাশস্থল ও সুউচ্চ যেন আল্লাহ্ আকাশ হতে অবতীর্ণ হয়েছে)। তার আগমন অশেষ কল্যাণময় হবে এবং ঐশী গৌরব ও প্রতাপ প্রকাশের কারণ হবে। জ্যোতি আসছে, জ্যোতি। খোদা তাকে তাঁর সন্তুষ্টির সৌরভ নির্যাস দ্বারা সিক্ত করেছেন। আমরা তার মধ্যে আপন রূহ ফুঁকে দিবো এবং খোদার ছায়া তার শিরে থাকবে। সে দ্রুত বড় হবে এবং বন্দীদের মুক্তির কারণ হবে। আর পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে খ্যাতি লাভ করবে। জাতিসমূহ তার কাছ থেকে আশিস লাভ করবে। তখন তার আত্মিক কেন্দ্র আকাশের দিকে উত্তোলিত হবে, ওয়া কানা আমরাম্মাক্বযিয়া (অর্থাৎ এটিই আল্লাহ্‌র অটল মীমাংসা)

(মাজমু' আ ইশতেহারাত, খণ্ড ১, পৃ. ১০০-১০২)

এই একই ইশতেহারে নিজের বংশ ও পরিবারের বিস্তার ও সমৃদ্ধি সম্পর্কে আল্লাহ তা' আলার প্রতিশ্রুতি উল্লেখ করে হযরত আকদাস (আলাইহিস সালাম) আরও বলেন:

"অতঃপর পরম দয়ালু আল্লাহ আমাকে সুসংবাদ দিয়ে বললেন- তোমার গৃহ বরকতে পরিপূর্ণ হবে এবং আমি তোমার ওপর আমার নিয়ামতসমূহ পূর্ণ করব; আর বরকতময় স্ত্রীদের মাধ্যমে-যাদের মধ্যে কিছু তুমি পরবর্তীতে পাবে- তোমার বংশধারা বৃদ্ধি পাবে। আমি তোমার সন্তানদের বহুগুণ বৃদ্ধি করব এবং বরকত দান করব, যদিও তাদের মধ্যে কেউ কেউ অল্প বয়সে ইন্তেকাল করবে। তোমার বংশধারা বহু দেশে ছড়িয়ে পড়বে; কিন্তু তোমার পিতৃভ্রাতাদের প্রত্যেকটি শাখা কেটে দেওয়া হবে এবং তারা নিঃসন্তান হয়ে দ্রুত শেষ হয়ে যাবে-যদি তারা তওবা না করে। আল্লাহ তাদের ওপর বিপদের পর বিপদ নাজিল করবেন, যতক্ষণ না তারা সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে যায়; তাদের ঘরবাড়ি বিধবায় পরিপূর্ণ হবে এবং তাদের গৃহে গজব নেমে আসবে। কিন্তু যদি তারা প্রত্যাবর্তন করে, তবে আল্লাহ রহমতের সঙ্গে তাদের দিকে প্রত্যাবর্তন করবেন। আল্লাহ তোমার বরকত চারদিকে বিস্তৃত করবেন এবং তোমার মাধ্যমে এক উজাড় গৃহকে আবার আবাদ করবেন এবং এক ভীতিকর গৃহকে বরকতে পূর্ণ করবেন। তোমার বংশধারা কখনো বিচ্ছিন্ন হবে না এবং শেষ দিন পর্যন্ত সবুজ-শ্যামল থাকবে। আল্লাহ পৃথিবীর সমাপ্তি পর্যন্ত তোমার নাম সম্মানের সঙ্গে স্থায়ী রাখবেন এবং তোমার আহ্বান পৃথিবীর প্রান্তসমূহ পর্যন্ত পৌঁছে দেবেন। আমি তোমাকে উন্নীত করব এবং নিজের দিকে ডেকে নেব, কিন্তু তোমার নাম কখনোই পৃথিবীর পৃষ্ঠ থেকে মুছে যাবে না। যারা তোমার অপমানের চিন্তায় লিপ্ত, তোমার ব্যর্থতা কামনা করে এবং তোমার ধ্বংসের ষড়যন্ত্রে রত-তারা নিজেরাই ব্যর্থ হবে এবং ব্যর্থতা ও হতাশার মধ্যেই মৃত্যুবরণ করবে। কিন্তু আল্লাহ তোমাকে সম্পূর্ণ সফল করবেন এবং তোমার সকল কামনা পূর্ণ করে দেবেন। আমি তোমার খাঁটি ও একনিষ্ঠ ভালোবাসার অনুসারীদের দলও বৃদ্ধি করব এবং তাদের জীবন ও সম্পদে বরকত দান করব, তাদের সংখ্যা বাড়িয়ে দেব; আর তারা কিয়ামত পর্যন্ত বিদ্বেষপরায়ণ ও বিরোধীদের সেই অন্য দলের ওপর বিজয়ী থাকবে। আল্লাহ তাদের ভুলবেন না এবং পরিত্যাগ করবেন না; তারা নিজেদের নিষ্ঠা অনুযায়ী প্রতিদান পাবে। তুমি আমার কাছে বনী ইসরাঈলের নবীদের ন্যায় (অর্থাৎ ছায়াস্বরূপ সাদৃশ্যপূর্ণ); তুমি আমার কাছে আমার তাওহীদের ন্যায়। তুমি আমার থেকে এবং আমি তোমার থেকে। আর সে সময় আসছে-বরং নিকটেই- যখন আল্লাহ রাজা ও ধনবানদের হৃদয়ে তোমার ভালোবাসা স্থাপন করবেন, এমনকি তারা তোমার পোশাক থেকেও বরকত অন্বেষণ করবে। হে অস্বীকারকারী ও সত্যের বিরোধীগণ! যদি তোমরা আমার বান্দা সম্পর্কে সন্দিহান হও, যদি তোমরা সেই অনুগ্রহ ও দয়াকে অস্বীকার করো যা আমরা আমাদের বান্দার ওপর করেছি, তবে তোমরাও নিজেদের পক্ষে এই রহমতের নিদর্শনের মতো কোনো সত্য নিদর্শন উপস্থাপন করো-যদি তোমরা সত্যবাদী হও। আর যদি তা উপস্থাপন করতে না পারো-এবং স্মরণ রেখো, তোমরা কখনোই পারবে না-তবে সেই আগুনকে ভয় করো, যা অবাধ্য, মিথ্যাবাদী ও সীমালঙ্ঘনকারীদের জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে। যথেষ্ট।"

পরের মাসেই, অর্থাৎ ২২ মার্চ ১৮৮৬ তারিখের আরেকটি ইশতেহারে হযরত আকদাস (আলাইহিস সালাম) এই ভবিষ্যদ্বাণী সম্পর্কে আল্লাহ তা' আলার আরও একটি প্রতিশ্রুতি উল্লেখ করে বলেন:

"এই ধরনের এক পুত্র আল্লাহর প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী অবশ্যই নয় বছরের সময়সীমার মধ্যে জন্মগ্রহণ করবে-শিগগির হোক বা বিলম্বে, যেভাবেই হোক, এই সময়সীমার মধ্যেই তার জন্ম হবে।"

(মাজমু' আ ইশতেহারাত, খণ্ড ১, পৃ. ১১৩)

অতএব আল্লাহর প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী সেই প্রতিশ্রুত পুত্র ভবিষ্যদ্বাণীর ঠিক তিন বছর পর, ২৩ মার্চ ১৮৮৯ তারিখে জন্মগ্রহণ করেন-এবং এই পবিত্র দিনটিই জামাআতে আহমদিয়া মুসলিম জামাতের প্রতিষ্ঠা দিবস।

৭ পাতার শেষাংশ

অঙ্গসংগঠনেও তার সেবা করার সৌভাগ্য লাভ হয়েছে। ইবাদতকারী এবং নামায-রোযা নিয়মিত পালনকারী ছিলেন। খিলাফতের প্রতি আহ্বানে সাড়া দানকারীব্যক্তিদের মধ্যে প্রথম সারির অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। ক্রীড়াবিদও ছিলেন, অ্যাথলেটও ছিলেন। এ দৃষ্টিকোণ থেকে তিনি ক্রীড়া বিভাগকে অনেক সুসংগঠিত করেছেন। তার বিয়ে কাশ্মীরের একটি পরিবারে হয়েছিল। তার সহধর্মিণী পূর্বেই মৃত্যুবরণ করেছেন। মরহুমের দুই ছেলে এবং এক কন্যা রয়েছে, সবাই জামা'তের সেবা করছে। আল্লাহ্ তা'লা তার সাথে ক্ষমা ও দয়াসুলভ আচরণ করুন।

দ্বিতীয় স্মৃতিচারণ হলো মীর মুশতাক আহমদ সাহেবের পুত্র শ্রদ্ধেয় মীর হাবীব আহমদ সাহেবের। সম্প্রতি ৭৯ বছর বয়সে তিনি মৃত্যুবরণ করেছেন। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। তিনি অত্যন্ত স্নেহশীল, মিশুক স্বভাবের এবং খিলাফতের প্রতি আত্মনিবেদিত সত্তা ছিলেন। আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় মূসী ছিলেন। তার পরিবারে আহমদীয়াতের গোড়াপত্তন তার দাদা বাবু আব্দুর রহীম সাহেবের মাধ্যমে হয়েছিল। তিনি 'ফারুক' পত্রিকার সম্পাদক হযরত মীর কাসেম আলী সাহেব (রা.)-র মাধ্যমে ১৯০৩ সালে বয়আত গ্রহণ করেছিলেন। হযরত মীর কাসেম আলী সাহেব (রা.) মীর হাবীব সাহেবের পিতা মুশতাক আহমদ সাহেবকে পালকপুত্র হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন, কেননা হযরত মীর কাসেম আলী সাহেবের নিজের কোনো সন্তান ছিল না। মীর হাবীব সাহেব লাহোর সরকারি কলেজ থেকে আই.এসসি এবং পরে বি.এসসি সম্পন্ন করেন। এরপর তিনি পদার্থবিদ্যায় এম.এসসি ডিগ্রি অর্জন করেন। তারপর তিনি বহির্দেশে চলে যান।

তার জামা'তী সেবাসমূহ হলো- ১৯৭০ থেকে ১৯৭১ সাল পর্যন্ত তিনি তা'লীমুল ইসলাম কলেজে শিক্ষক হিসেবে পাঠদানের মাধ্যমে সেবা প্রদানের সূচনা করেন। তখনো কলেজ জাতীয়করণ হয় নি। ১৯৭৩ থেকে ১৯৭৬ সাল পর্যন্ত নুসরত জাহাঁ স্কীমের অধীনে সিয়েরালিওনে যান। সেখানে ফ্রি টাউন-এ পদার্থবিদ্যার শিক্ষক হিসেবে সেবা প্রদানের সৌভাগ্য লাভ করেন। অতঃপর তিনি ১৯৭৬ সালে পাকিস্তানে ফেরত আসেন। এরপর ১৯৭৬ সালেই তিনি পুনরায় নাইজেরিয়ায় চলে যান আর সেখানে ১৯৮৭ সাল পর্যন্ত সরকারি স্কুলে চাকরি করেন। সেখানে অর্থাৎ আফ্রিকায় থাকাকালীন তিনি ১৯৮৭ সালেই নিজ জীবন ওয়াকফ করেন। ওয়াকেফে যিন্দেগী হিসেবে ১৯৮৭ সালে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.) তাকে হামরাশার আহমদীয়া সিনিয়র সেকেন্ডারি স্কুলের অধ্যক্ষ হিসেবে নিযুক্ত করেন, যেখানে তিনি ১৯৯১ সাল পর্যন্ত সেবা প্রদান করার সৌভাগ্য পেয়েছেন। এরপর তিনি পুনরায় পাকিস্তানে ফেরত আসেন ও এখানে এসেও জামা'তের সেবায় নিযুক্ত থাকেন। ১৯৯২ সালে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.) তাকে একটি কারিগরি প্রতিষ্ঠানের সম্ভাবনা খতিয়ে দেখার জন্য সিয়েরা লিওনে প্রেরণ করেন। সেখানে তার সুদক্ষ রিপোর্ট অনুযায়ী কিছু কাজ সম্পন্ন হয়। ১৯৯৬ সালে নাযারাত তা'লীমের অধীনে রাবওয়াতে নুসরাত জাহাঁ একাডেমিতে তার নিয়োগ হয় এবং তিনি পদার্থবিদ্যা পড়াতে থাকেন আর সে অবস্থায় তিনি অবসর গ্রহণ করেন। একইভাবে তিনি সদর উমূমী দপ্তরে আর উমূমী ইসলাহী কমিটিতে স্বেচ্ছাসেবী হিসেবে সেবাকরার সুযোগ পান।

তার স্ত্রী লেখেন, আমার স্বামী নামায-রোযায় অভ্যস্ত ছিলেন, অনেক কোমল স্বভাবের অধিকারী ছিলেন আর কখনো কোনো চাহিদা উপস্থাপন করতেন না। পড়ালেখা করতে খুব ভালোবাসতেন ও একজন জ্ঞানপিপাসু মানুষ ছিলেন। কেউ আসলে, উপহার আনতে চাইলে তার চাহিদা কেবল এটিই হতো যে, আমার জন্য বই নিয়ে এসো। আর তিনি জ্ঞানগর্ভ বইপুস্তক পড়তেন। একইভাবে তিনি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর বইও অনেক বেশি অধ্যয়ন করতেন। কখনো ভ্রান্ত কথা বলতেন না। কোনো কথা জানা না থাকলে নীরব থাকতেন, তবুও ভুল কিছু বলতেন না। তার মেয়েও একই গুণাবলির কথা বর্ণনা করেছেন। আমিও তাকে একজন ভদ্র মানুষ হিসেবে পেয়েছি আর নিজের কাজেই মগ্ন থাকতেন। এছাড়া ওয়াকফের দায়িত্ব নিষ্ঠার সাথে পালন করেছেন। আল্লাহ্ তা'লা তার সাথে ক্ষমা ও দয়াসুলভ আচরণ করুন।

মীর মুহাম্মদ ইসহাক সাহেবের দৌহিত্রী সৈয়্যদা লুবনা সাহেবার সাথে তার বিবাহ হয়- যিনি মেজর সাঈদ আহমদ সাহেবের কন্যা ছিলেন। আর আমরা জানি, হযরত মীর মুহাম্মদ ইসহাক সাহেব ছিলেন হযরত মীর নাসের নওয়াব সাহেবের পুত্র; তিনি জামা'তের একজন সুবিদিত বুযুর্গ। তাঁর অনুবাদকৃত কুরআন করীম জামা'তে অনেক প্রসিদ্ধ। সর্বোপরি আল্লাহ্ তা'লা মরহুমের প্রতি কৃপা করুন আর তার রূহের মাগফিরাত করুন। (আমীন)

(সৌজন্যে: আলফজল ইন্টারন্যাশনাল, ১৮ ই জানুয়ারী, ২০২৬)

মহান আল্লাহর বাণী

হে যাহারা ঈমান আনিয়াছ! তোমরা সকলেই পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণের আওতায় প্রবেশ কর এবং শয়তানের পদাংক অনুসরণ করিও না, সে নিশ্চয় তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু। (আল-বাকারা: ২০৯))

দোয়াপ্রার্থী: **Azkarul Islam, jamat Ahmadiyya Amaipur (Birbhum)**

মহান আল্লাহ্‌র বাণী

তুমি বল, 'হে রাজ্যাধিপতি আল্লাহ্! তুমি যাহাকে চাহ রাজত্ব দান কর এবং যাহার নিকট হইতে চাহ রাজত্ব কাড়িয়া লও।

(আলে ইমরান:২৭)

দোয়াপ্রার্থী: **Golam Mustafa Sb., Berhampur, Murshidabad**

ভবিষ্যদ্বাণীসমূহের আলোকে হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.)-এর মর্যাদা

ইনায়েতুল্লাহ্ সাহেব, এডিশিনাল নাযির ইসলাহ ও ইরশাদ, কাদিয়ান

আল্লাহ তাআলার একটি সুপ্রতিষ্ঠিত সুন্নত (রীতি) এই যে, তিনি ভবিষ্যৎ যুগে যেসব নবী, রসূল ও তাঁদের উত্তরাধিকারীদের প্রেরণ করবেন, সে সম্পর্কে তিনি পূর্বেই ভবিষ্যদ্বাণীর মাধ্যমে মানবজাতিকে অবহিত করে দেন। তাঁদের গুণাবলি, নিদর্শন ও অবস্থা আগেই বর্ণনা করে তিনি তাঁদের মহিমা পূর্বঘোষিত করে দেন। সুতরাং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-যাঁকে আল্লাহ তাআলা খাতামুন্নবিয়্যীন ও রহমাতুল্লিল 'আলামীন হিসেবে প্রেরণ করেছেন এবং যাঁর সম্পর্কে হাদীস কুদসীতে এসেছে: 'লাও লাকা লামা খালাকতুল আফলাক' "তুমি না হলে আমি আসমানসমূহ সৃষ্টি করতাম না-তাঁর সম্পর্কেও, তাঁর আধ্যাত্মিক দাসত্বে যাঁকে ইমাম মাহদী হিসেবে প্রেরণ করা হবে, সে বিষয়ে তাঁকে অবহিত করা হয়েছিল। অতএব, পবিত্র কুরআনে এই মহান ভবিষ্যদ্বাণীর উল্লেখ করে আল্লাহ তাআলা বলেন-

هُوَ الَّذِیْ بَعَثَ فِی الْاُمِّیّٖنَ رَسُوْلًا مِّنْهُمْ یَتْلُوْا عَلَیْهِمْ اٰیٰتِهٖ وَیُزَكِّیْهِمْ وَیُعَلِّمُهُمُ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ ۗ وَاِنْ كَانُوْا مِنْ قَبْلُ لَفِیْ ضَلٰلٍ مُّبِیْنٍ ۙ وَّاٰخَرِیْنَ مِنْهُمْ لَمَّا یَلْحَقُوْا بِهِمْ ؕ وَهُوَ الْعَزِیْزُ الْحَكِیْمُ

অর্থাৎ, তিনিই সেই সত্তা যিনি উম্মীদের মধ্য থেকে তাদেরই একজন মহান রাসূল প্রেরণ করেছেন-যিনি তাদের কাছে আল্লাহর নিদর্শনসমূহ পাঠ করেন, তাদেরকে পবিত্র করেন এবং কিতাব ও প্রজ্ঞা শিক্ষা দেন; যদিও তারা পূর্বে ছিল স্পষ্ট গোমরাহিতে। আর তিনি তাঁদেরই মধ্য থেকে অন্যদের জন্যও তাঁকে প্রেরণ করেছেন, যারা এখনো তাদের সঙ্গে মিলিত হয়নি। তিনি সর্বশক্তিমান, পরম প্রজ্ঞাময়।

(সূরা আল-জুমু'আহ, ৬২:২-৪)

এই আয়াতের ব্যাখ্যায় সাইয়্যিদুনা হযরত মসীহে মওউদ (আলাইহিস সালাম) বলেন-

"এই আয়াতের সারমর্ম এই যে, তিনিই সেই আল্লাহ, যিনি এমন এক সময়ে রসূল প্রেরণ করেছিলেন যখন মানুষ জ্ঞান ও প্রজ্ঞা থেকে বঞ্চিত হয়ে পড়েছিল, এবং আত্মার পূর্ণতা অর্জনের জন্য প্রয়োজনীয় দীনী ও আধ্যাত্মিক জ্ঞান সম্পূর্ণরূপে লুপ্ত হয়ে গিয়েছিল; মানুষ পথভ্রষ্টতায় নিমজ্জিত ছিল। তখন আল্লাহ তাআলা তাঁর উম্মী রসূলকে প্রেরণ করেন, আর সেই রসূল তাদের আত্মাকে পবিত্র করেন এবং কিতাব ও হিকমতের জ্ঞানে পরিপূর্ণ করেন এরপর তিনি বলেন, আরেকটি দলও রয়েছে, যারা শেষ যুগে আত্মপ্রকাশ করবে। তারা প্রথমে অন্ধকার ও গোমরাহিতে থাকবে এবং জ্ঞান, প্রজ্ঞা ও দৃঢ় বিশ্বাস থেকে দূরে থাকবে। তারপর আল্লাহ তাদেরকে সাহাবাদের রঙে রঙিন করবেন-অর্থাৎ সাহাবারা যা প্রত্যক্ষ করেছিলেন, তাদেরকেও তা প্রত্যক্ষ করানো হবে; এমনকি তাদের সত্যনিষ্ঠা ও বিশ্বাস সাহাবাদের সত্যনিষ্ঠা ও বিশ্বাসের ন্যায় হয়ে যাবে।

আর সহীহ হাদীসে উল্লেখ আছে যে, মহানবী (সা.) যখন এই আয়াতের ব্যাখ্যা করেন, তখন তিনি সালমান ফারসী (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর কাঁধে হাত রেখে বলেন:

لو كان الايمان معلقاً بالثريالنا له رجل من فارس

অর্থাৎ-'যদি ঈমান সুরাইয়া নক্ষত্রেও (সপ্তর্ষি মণ্ডলে) পৌঁছে যায়, তবে পারস্য বংশীয় একজন ব্যক্তি তা ফিরিয়ে আনবে।' এর দ্বারা ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, শেষ যুগে ফার্সি বংশোদ্ভূত একজন ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করবেন-সে সময়ে, যার সম্পর্কে লেখা আছে যে কুরআন আসমানে উঠিয়ে নেওয়া হবে। এটাই মসীহে মওউদের যুগ, আর সেই ফার্সি বংশোদ্ভূত ব্যক্তিই হলেন মসীহে মওউদ।"

(আইয়ামুস্-সুলহ, রূহানী খাযাইন, খণ্ড ১৪, পৃ. ৩০৫-৩০৬)

হাকীকাতুল ওহী গ্রন্থে "ওয়া আখারীনা মিনহুম লাম্মা ইয়ালহাকুন'-এই বাক্যাংশের ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে যে, মুহাম্মদ (সা.)-এর উম্মতের মধ্য থেকে শেষ যুগে আরেকটি দল আসবে। সহীহ হাদীসে বর্ণিত আছে যে, এই আয়াতের প্রসঙ্গে মহানবী (সা.) সালমান ফারসী (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর পিঠে হাত রেখে বলেন:

لو كان الايمان معلقاً بالثريالنا له رجل من فارس

"যদি ঈমান সুরাইয়ায় ঝুলেও থাকে, তবে পারস্য বংশীয় একজন ব্যক্তি তা ফিরিয়ে আনবে।"

এই ভবিষ্যদ্বাণী মসীহে মওউদের সঙ্গেই সম্পর্কিত। আল্লাহ তাআলা বারাহীন-ই-আহমদিয়া-তে এই ভবিষ্যদ্বাণীকে তাঁর ওপর ওহী হিসেবে অবতীর্ণ করে নিশ্চিত করেন; তার আগে এর কোনো নির্দিষ্ট বাস্তবায়ন নির্ধারিত ছিল না। আল্লাহর ওহীর মাধ্যমে তাঁকেই এর নির্দিষ্ট মিসদাক (সত্যায়নকারী) নির্ধারণ করা হয়েছে-সুতরাং সমস্ত প্রশংসা আল্লাহরই।

(হাকীকাতুল ওহী, রূহানী খাযাইন, খণ্ড ২২, পৃ. ৪০৭, টীকা)

সহীহ মুসলিম-এ সাহাবীদের ফযিলত অধ্যায়ে 'পারস্য বংশীয় একজন ব্যক্তি' প্রসঙ্গে রজুল (একজন ব্যক্তি) শব্দের পরিবর্তে রিজাল (ব্যক্তিবর্গ) শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, সূরা জুমু'আহে যে মহান সত্তার-অর্থাৎ ইমাম মাহদী, মসীহে মওউদ (আলাইহিস সালাম)-সংবাদ দেওয়া হয়েছে, যিনি মহানবী (সা.)-এর আধ্যাত্মিক দাসত্বে প্রেরিত হবেন, তাঁর পরেও আল্লাহ তাআলা তাঁর জামাআত ও বংশধরদের মধ্য থেকে আরও মহান ব্যক্তিত্ব সৃষ্টি করবেন, যারা তাঁর মিশনকে এগিয়ে নিয়ে যাবে। তাঁদের মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা তাঁর প্রতিষ্ঠিত সিলসিলাকে সারা বিশ্বে বিস্তার করবেন এবং তাকে প্রাধান্য দান করবেন।

এ অনুযায়ী, মিশকাত-এ বর্ণিত একটি হাদীসে-যার বর্ণনাকারী হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-মহানবী (সা.) বলেন-

"ঈসা ইবনে মারইয়াম পৃথিবীতে অবতরণ করবেন, বিবাহ করবেন এবং তাঁর সন্তান হবে।"

(মিশকাতুল মাসাবীহ, মুজতাবাঈ সংস্করণ, পৃ. ৪৮০, বাব নুযূল 'ঈসা)

এই হাদীসের ব্যাখ্যায় হযরত মসীহে মওউদ (আলাইহিস সালাম) লিখেন-

"রাসূলুল্লাহ (সা.) আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রাপ্ত সংবাদ অনুযায়ী জানিয়েছেন যে, মসীহে মওউদ বিবাহ করবেন এবং তাঁর সন্তান হবে। এর মধ্যে এই ইঙ্গিত রয়েছে যে, আল্লাহ তাআলা তাঁকে এমন এক নেক সন্তান দান করবেন, যে নেকির দিক থেকে পিতার অনুরূপ হবে, বিরোধী হবে না, এবং আল্লাহর সম্মানিত বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত হবে।"

(আইনা-এ-কামালাতে ইসলাম, পৃ. ৫২৮)

আরেক স্থানে, মিশকাত-এ বর্ণিত এই হাদীসের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিনি লেখেন-

"এই ভবিষ্যদ্বাণী-যে মসীহে মওউদের সন্তান হবে-এর অর্থ এই যে, আল্লাহ তাঁর বংশধরদের মধ্য থেকে এমন একজনকে সৃষ্টি করবেন, যিনি তাঁর উত্তরাধিকারী হবেন এবং ইসলামের সমর্থন করবেন; যেমনটি আমার কিছু ভবিষ্যদ্বাণীতে ইতিপূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে।"

(হাকীকাতুল ওহী, পৃ. ৩১২)

মসীহে মওউদের আগমন ও তাঁর বংশধরদের মধ্য থেকে প্রতিশ্রুত খলীফা সম্পর্কে প্রাচীন ধর্মীয় গ্রন্থসমূহেও ভবিষ্যদ্বাণী পাওয়া যায়, যা মহানবী মুহাম্মদ (সা.)-এর ভবিষ্যদ্বাণীকে সমর্থন করে। উদাহরণস্বরূপ, ইহুদিদের মৌলিক ধর্মগ্রন্থ তালমুদ-এ লেখা আছে-

"এটাও বলা হয় যে, তিনি (অর্থাৎ মসীহ) ইন্তেকাল করবেন এবং তাঁর রাজত্ব তাঁর পুত্র ও পৌত্রের কাছে অর্পিত হবে।"

এর প্রমাণ হিসেবে ইয়াসাইয়া ৪২:৪ পেশ করা হয়, যেখানে বলা হয়েছে যে, তিনি দুর্বল হবেন না বা ক্ষান্ত হবেন না যতক্ষণ না তিনি পৃথিবীতে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করেন।

(তালমুদ, সংকলক: জোসেফ বার্কলে, অধ্যায় ৫, লন্ডন, ১৮৭৮)

যরতুশত্রী ধর্মগ্রন্থ দাসাতীর-এ সাসান প্রথমের নামে একটি ভবিষ্যদ্বাণী আছে-যা মূলত পাহলভি ভাষায় ছিল এবং পরে ফারসিতে রূপান্তরিত হয়। এর সারমর্ম বাংলায় হলো-

"আরবি শরিয়তের ওপর এক হাজার বছর অতিবাহিত হলে ধর্ম এমনভাবে বিভক্ত হয়ে পড়বে যে, স্বয়ং শরিয়তপ্রণেতা -কে যদি তা উপস্থাপন করা হয়, তবে তিনিও একে চিনতে পারবেন না তাদের মধ্যে বিভেদ ও মতভেদ সৃষ্টি হবে এবং দিন দিন তা শত্রুতা ও বিরোধিতায় পরিণত হবে যখন এমন হবে, তখন সুসংবাদ গ্রহণ করো-যদি যুগের মাত্র একদিনও অবশিষ্ট থাকে, তবে আমি তোমাদের মধ্য থেকে (ফার্সি বংশোদ্ভূত) একজন ব্যক্তিকে দাঁড় করাব, যে তোমাদের হারানো সম্মান ও মর্যাদা ফিরিয়ে আনবে এবং তা পুনঃপ্রতিষ্ঠা করবে। আমি তোমাদের বংশ থেকে নবুয়ত ও নেতৃত্ব (খিলাফত) প্রত্যাহার করব না।"

শেষ বাক্যটি-"আমি তোমাদের বংশ থেকে নবুয়ত ও নেতৃত্ব প্রত্যাহার করব না-এই ইঙ্গিত দেয় যে, শেষ যুগের প্রতিশ্রুত ব্যক্তি যখন

যুগ খলীফার বাণী

প্রত্যেক জীবই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করিবে। এবং নিশ্চয় কিয়ামতের দিনই কেবল তোমাদিগকে তোমাদের কর্মের পূর্ণ প্রতিদান দেওয়া হইবে। (আলে ইমরান: ১৮৬)

দোয়াপ্রার্থী: Humayun Kabir Molla, Nalhati, Birbhum

আসবেন, তখন তাঁর বংশধরদের মধ্য থেকেই কেউ তাঁর উত্তরাধিকারী হবে।

হযরত মসীহে মওউদ (আলাইহিস সালাম) বলেন–

"রহমত অবতরণের দ্বিতীয় পদ্ধতি হলো–রসূল, নবী, ইমাম, আউলিয়া ও খলীফাদের প্রেরণ–যাতে মানুষ তাঁদের অনুসরণের মাধ্যমে সঠিক পথে আসে এবং তাঁদের আদর্শে নিজেকে গড়ে তুলে মুক্তি লাভ করে। অতএব, আল্লাহ তাআলা ইচ্ছা করেছেন যে, এই উভয় দিকই এই অধমের বংশধরদের মাধ্যমে প্রকাশিত হোক।"

(সবুজ ইশতেহার, রূহানী খাযাইন, খণ্ড ২, পৃ. ৪৫৩, টীকা)

মহানবী (সা.)–এর উম্মতের মধ্যে হযরত শাহ নিয়ামতুল্লাহ নামে এক মহান ওলী অতিবাহিত হয়েছেন–যিনি ইলহাম ও কাশফপ্রাপ্ত ছিলেন। তিনি মসীহের দ্বিতীয় আগমন এবং তাঁর এক মহান পুত্রের বিষয়ে ভবিষ্যদ্বাণী করেন। এই ভবিষ্যদ্বাণীটি ফারসি কাব্যে রচিত; এতে মসীহে মওউদের আবির্ভাব–পূর্ব ঘটনাবলি, তাঁর যুগ ও নাম নির্ধারণ করা হয়েছে এবং এক স্মরণীয় পুত্রের সুসংবাদ দেওয়া হয়েছে। কবিতার পংক্তিগুলো হলো–

"আমি অক্ষরসমূহ আ–হা–মীম–ওয়াও–দাল পড়ি; আমি সেই খ্যাতিমান নামটি দেখতে পাই।

যখন তাঁর যুগ সফলভাবে সম্পন্ন হবে, তখন তাঁর পুত্র স্মারক হিসেবে অবশিষ্ট থাকবে।"

এর ব্যাখ্যায় নিশান–এ–আসমানী গ্রন্থে মসীহে মওউদ (আলাইহিস সালাম) বলেন–

"অর্থাৎ আল্লাহ তাআলার ফয়সালা এই যে, তিনি তাঁকে এক পারসা পুত্র দান করবেন, যে তাঁরই আদর্শের অনুরূপ হবে, তাঁর রঙে রঙিন হবে এবং তাঁর পরে তাঁর স্মারক হিসেবে অবশিষ্ট থাকবে। প্রকৃতপক্ষে এটি সেই ভবিষ্যদ্বাণীর সঙ্গেই সামঞ্জস্যপূর্ণ, যা আমি এক পুত্র সম্পর্কে করেছি।"

(নিশান–এ–আসমানী, রূহানী খাযাইন, খণ্ড ৪, পৃ. ৩৭৩)

আহমদিয়া মুসলিম জামাআত দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে–এবং তাদের ১৩৬ বছরের ইতিহাসের প্রতিটি দিন ও প্রতিটি মুহূর্ত তার সাক্ষ্য বহন করে–যে, বর্তমান যুগ সম্পর্কিত প্রাচীন কিতাবসমূহে বিদ্যমান ভবিষ্যদ্বাণীসমূহ, যেগুলোর আলোকে সাইয়্যিদুল আম্বিয়া, খাতামুন্ নবিয়্যীন হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা (সা.)–এর আধ্যাত্মিক পুত্রের আবির্ভাব হওয়ার কথা ছিল, সেগুলোর পূর্ণ বাস্তবায়ন ঘটেছে আহমদিয়া জামাআতের প্রতিষ্ঠাতা হযরত মির্জা গুলাম আহমদ কাদিয়ানী, মসীহে মওউদ ও মাহদী মাওউদ (আলাইহিস সালাম)–এর পবিত্র সত্তায়।

এই প্রাচীন ভবিষ্যদ্বাণীসমূহের আলোকে আল্লাহ তাআলা তাঁর সত্যতার প্রমাণস্বরূপ তাঁকে হাজার হাজার–বরং লক্ষাধিক–নিদর্শন ও মুজিযা দান করেছেন। এসবের মধ্যে একটি বিশেষ মর্যাদাসম্পন্ন নিদর্শন হলো–তাঁকে এমন নেক সন্তান দান করা, যারা তাঁর উত্তরাধিকারী হবে। সন্তানসংক্রান্ত যেসব সুসংবাদ তাঁকে দেওয়া হয়েছিল, তার মধ্যে মুস্‌লেহ্–মওউদ (প্রতিশ্রুত সংস্কারক)–এর ভবিষ্যদ্বাণী এক বিশেষ স্থান অধিকার করে।

এই ভবিষ্যদ্বাণী নিয়ে যখন পণ্ডিত লেখরাম, কিছু খ্রিষ্টান পাদ্রি এবং কিছু তথাকথিত মুসলমান অশালীন ভাষা ব্যবহার করে, তখন মসীহে মওউদ (আলাইহিস সালাম) একটি ইশতেহার প্রকাশ করে বলেন–

"চোখ খুলে দেখা উচিত–এটি কেবল একটি ভবিষ্যদ্বাণী নয়; বরং এক মহান আসমানী নিদর্শন, যা করুণাময় আল্লাহ তাআলা তাঁর প্রিয়, মহামহিম, দয়ালু নবী মুহাম্মদ মুস্তাফা (সা.)–এর সত্যতা ও মর্যাদা প্রকাশের জন্য প্রকাশ করেছেন।"

মুসলেহ্–মওউদ–এর ভবিষ্যদ্বাণী আরও এক কারণে মহান–১৯৪৪ সালের জানুয়ারিতে লাহোরে অবস্থানকালে আল্লাহ তাআলা এক মহান রুইয়ার মাধ্যমে হযরত মির্জা বশীরুদ্দীন মাহমুদ আহমদ, মুস্‌লেহ্–মওউদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু)–কে অবহিত করেন যে, ২০ ফেব্রুয়ারি ১৮৮৬ সালে হোশিয়ারপুর থেকে মসীহে মওউদ (আলাইহিস সালাম) যে প্রতিশ্রুত পুত্রের জন্মের ঘোষণা দিয়েছিলেন–যার সম্পর্কে বলা হয়েছিল যে, তাঁর মধ্যে মসীহী আত্মা থাকবে, তিনি দ্রুত বিকশিত হবেন, বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ জ্ঞানে পরিপূর্ণ হবেন, পৃথিবীর প্রান্তসীমা পর্যন্ত খ্যাতি লাভ করবেন এবং জাতিসমূহ তাঁর দ্বারা উপকৃত হবে–তার বাস্তব মিসদাক তিনিই।

এই ঐশী ইলহামের পর, ২৮ জানুয়ারি ১৯৪৪ তারিখে কাদিয়ানের মসজিদ আকসায় তিনি জাঁকজমকপূর্ণভাবে ঘোষণা করেন যে, তিনিই মুস্‌লেহ্ মওউদের ভবিষ্যদ্বাণীর মিসদাক। তিনি বলেন, রুইয়ার সময় তাঁর মুখ থেকে যে বাক্যটি উচ্চারিত হয়েছিল তা হলো–

"ওয়া আনা আল–মসীহ আল–মাও'উদ ওয়া মিসলুহু ওয়া খলিফাতুহু

অর্থাৎ: "আর আমিও মসীহে মওউদ–অর্থাৎ তাঁর সদৃশ এবং তাঁর খলীফা।"

(তারীখ–এ–আহমদিয়্যাত, খণ্ড ৮, পৃ. ৫১২–৫১৯; আহমদিয়া গেজেট কানাডা, ফেব্রুয়ারি ২০১৫ থেকে গৃহীত)

নিজের খিলাফত সম্পর্কে হযরত মুস্‌লেহ্––মওউদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন–

"আমি সাধারণ অর্থে খলীফা নই; বরং আমি প্রতিশ্রুত খলীফা। আমি মামুর (নিযুক্ত নবী) নই, কিন্তু আমার কণ্ঠ আল্লাহর কণ্ঠ। আল্লাহ তাআলা মসীহে মওউদ (আলাইহিস সালাম)–এর মাধ্যমে এর সংবাদ দিয়েছিলেন। সুতরাং এই খিলাফতের অবস্থান মামুরিয়াত ও খিলাফতের মধ্যবর্তী। এটি এমন কোনো সুযোগ নয় যে, আহমদিয়া জামাআত একে অবহেলা করে পার পেয়ে যাবে এবং পরে আল্লাহর দরবারে সফলতা দাবি করবে। যেমনটি সত্য যে, নবী প্রতিদিন আসেন না, তেমনি এটিও সত্য যে, প্রতিশ্রুত খলীফারাও প্রতিদিন আসেন না।"

(রিপোর্ট: মজলিসে মুশাওয়ারাত, ১৯৩৬)

কাব্যিক শ্রদ্ধার্ঘ্য

হে ফজল–এ–উমর, তোমার উদার গুণাবলি–

স্মরণ হলেই প্রতিটি আত্মা উন্মাদ হয়ে ওঠে।

প্রতিদিন এই ঘূর্ণায়মান দুনিয়া তোমার মতো মানুষ আনে না;

এই দৈনন্দিন আবর্তন, এই যুগচক্র।

এক সময় আসবে, যখন সকল মানুষ বলবে–

উম্মতের এই নিবেদিত খাদেমের প্রতি আল্লাহ রহম করুন।

****

১২ পাতার পর.....

তিনি লাভ করেছিলেন রাসূলুল্লাহ্ মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ও হযরত মসীহে মওউদ (আলাইহিস সালাম)–এর উলুল্–আজমের বরকতে।

এরপর রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ও হযরত মসীহে মওউদ (আলাইহিস সালাম)–এর জীবনের ঐতিহাসিক দৃষ্টান্ত পেশ করা হয়–যেমন পারস্যের কিসরা ও তার মৃত্যুর ভবিষ্যদ্বাণী, এবং হযরত মসীহে মওউদের ঘোষণা যে একটি বাড়ি তাঁর অধিকারে আসবে, যা পরবর্তীতে মসজিদ আকসার অংশে পরিণত হয়।

অনুরূপভাবে এই অটল সংকল্পের প্রকাশ হযরত মুসষবয মওউদের জীবনেও দেখা যায়। ১৯৩৫ সালে মজলিসে আহরার কাদিয়ান ধ্বংস ও মিনারাতুল মসীহ ভেঙে ফেলার হুমকি দেয়। হযরত মুসষবয মওউদ শান্তভাবে বলেন যে, আল্লাহর সাহায্য তাঁদের সঙ্গে রয়েছে এবং তিনি দেখছেন যে আহরারদের পায়ের নিচ থেকে মাটি সরে যাচ্ছে।

আরেকটি ঘটনা ঘটে ১৯৫৩ সালের পাকিস্তানের অ্যান্টি–আহমদিয়া আন্দোলনের সময়। মাওলানা মওদূদী পরামর্শ দেন যে, রক্তপাত এড়াতে জামা'আত যেন নিজেকে অমুসলিম সংখ্যালঘু ঘোষণা করে। জামা'আতের প্রতিনিধিরা দৃঢ়ভাবে এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন এবং বলেন–খোদায়ী জামা'আত সব যুগেই বিরোধিতার মুখোমুখি হয়েছে এবং শেষ পর্যন্ত সফল হয়েছে।

এই পরিস্থিতিতে হযরত মুসলেহ মওউদ দৃঢ় কণ্ঠে ঘোষণা করেন:

"আল্লাহর অনুগ্রহে মাওলানা মওদূদীর অনুসরণে কোনো সরকার কখনোই প্রতিষ্ঠিত হবে না।"

(জওয়াবে কাদিয়ানি মসলা, পৃষ্ঠা ১২৩)

আল্লাহ্ যাঁকে উলুল্–আজম বানিয়েছিলেন, তাঁকে সে অনুযায়ী শক্তিও দান করেছিলেন। এখানে অত্যন্ত সংক্ষেপে মাত্র কয়েকটি দৃষ্টান্ত পেশ করা হলো; নতুবা এ ধরনের উদাহরণ অসংখ্য। আর এসব কিছুই ছিল কেবল ইসলাম ধর্মের মর্যাদা ও সম্মানের জন্য।

আল্লাহ্ তা'আলা এই উলুল্–আজম হযরত মুসলেহ মওউদের মর্যাদা আরও উন্নীত করুন–আমিন।

একদিন এমন সময় আসবে, যখন সকল মানুষ বলবে–

উম্মাহর এই নিবেদিতপ্রাণ খাদেমের উপর আল্লাহর রহমত বর্ষিত হোক।

মহান আল্লাহ্‌র বাণী

নিশ্চয় আল্লাহ্ তিনি, যিনি পরম রিয্‌কদাতা, শক্তির অধিকারী, সুদৃঢ়। (আয যারিয়াত: ৫৯)

দোয়াপ্রার্থী: Abdur Rahaman Sb. Berhampur, Murshidabad

মহান আল্লাহ্‌র বাণী

হে যাহারা ঈমান আনিয়াছ! তোমরা সুদ খাইও না যাহা (ধন-সম্পদ ও অনিষ্টকে) বহুগুণে বৃদ্ধি করে এবং আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন কর যেন তোমরা সফলকাম হইতে পার। (আলে ইমরান: ১৩১)

দোয়াপ্রার্থী: Azizur Rahaman Sb, Lalbag, Murshidabad

দৃঢ় সংকল্পের অধিকারী- হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.)

আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে হযরত মসীহে মওউদ (আলাইহিস সালাম)-কে হযরত মুসলেহ মওউদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর নিদর্শন দান করা হয়েছিল-যা ছিল খোদায়ী কুদরত, রহমত ও নৈকট্যের এক উজ্জ্বল নিদর্শন। হযরত মির্জা বশীরুদ্দীন মাহমুদ আহমদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর পবিত্র জীবনকে মূলত দুইটি সুস্পষ্ট পর্যায়ে বিভক্ত করা যায়। প্রথম পর্যায়টি ছিল সেই সময়, যখন তিনি যুগের ইমাম হযরত আকদাস মসীহে মওউদ (আলাইহিস সালাম)-এর এবং পরবর্তীতে হযরত খলীফাতুল মসীহ প্রথম (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর ছায়ায় অবস্থান করছিলেন। দ্বিতীয় পর্যায়টি শুরু হয় তখন, যখন তিনি নিজে খিলাফতের মহান পদে অধিষ্ঠিত হন।

এটি একটি স্বীকৃত বাস্তবতা যে প্রত্যেক মানুষের জীবনেই উত্থান-পতন আসে এবং জীবনের বিভিন্ন পর্যায়ে তাকে পরীক্ষা, চ্যালেঞ্জ ও বিরোধিতার সম্মুখীন হতে হয়। হযরত মুসষবয মওউদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর জীবনও এসব ধাপ থেকে মুক্ত ছিল না। যেহেতু আল্লাহ্? তা'আলার নিযুক্ত সময়ের ইমাম তাঁর অনুসারীদের জন্য একটি দৃঢ় ঢালস্বরূপ হয়ে থাকেন, তাই তাঁর উপস্থিতিতে ব্যক্তিদের উপর সংগ্রামের বোঝা তুলনামূলকভাবে হালকা থাকে-কারণ ইমাম নিজেই তাঁদের রক্ষাকবচ হয়ে দাঁড়ান।

অতএব, ১৯১৪ সাল পর্যন্ত হযরত মুসষবয মওউদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর ক্ষেত্রেও এই অবস্থাই বিরাজমান ছিল; কেননা প্রথমে হযরত মসীহে মওউদ (আলাইহিস সালাম) এবং পরে হযরত খলীফাতুল মসীহ প্রথম (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর রূপে এই ঢাল বিদ্যমান ছিল। কিন্তু যখন হযরত মুসষবয মওউদ নিজেই খিলাফতের দায়িত্ব গ্রহণ করেন, তখন পরিস্থিতি পরিবর্তিত হয়। তখন তিনি নিজেই তাঁর অনুসারীদের জন্য ঢাল হয়ে দাঁড়ান এবং জামা'আতের সমগ্র দায়িত্ব তাঁর কাঁধে এসে পড়ে। এই বিরাট দায়িত্ব পালনের জন্য-যেমনটি ভবিষ্যদ্বাণীতে বলা হয়েছিল-আল্লাহ্ তা'আলা তাঁকে অসাধারণ দৃঢ়সংকল্প, অবিচলতা ও দূরদৃষ্টি দান করেন এবং তাঁকে উলুল্-আজম (অটল সংকল্পসম্পন্ন) মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করেন।

রাসূলুল্লাহ্ মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন:

"ইমাম হলো ঢাল; তাঁর আড়ালে থেকেই যুদ্ধ করা হয়।"

এই হাদিসের আলোকে স্পষ্ট হয় যে, মানুষের উচিত সময়ের ইমামের নেতৃত্বে এবং তাঁর পশ্চাতে থেকে সংগ্রাম করা। সুতরাং ১৯১৪ সালের পর থেকে হযরত মুসষবয মওউদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর জীবনে এই পরিস্থিতির সূচনা হয় এবং তীব্র বিরোধিতা শুরু হয়।

প্রথমদিকে এই বিরোধিতা বিশেষভাবে সেইসব ব্যক্তিদের পক্ষ থেকে প্রকাশ পায়, যারা হযরত আকদাস মসীহে মওউদ (আলাইহিস সালাম) ও হযরত খলীফাতুল মসীহ প্রথম (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর যুগে জামা'আতের ভেতরে গুরুত্বপূর্ণ মর্যাদা ও প্রভাবশালী অবস্থানে ছিলেন। তারা বিভিন্ন দায়িত্বে অধিষ্ঠিত ছিলেন, বাহ্যিক প্রতাপ-প্রভাবের অধিকারী ছিলেন এবং প্রচলিত পার্থিব মানদণ্ড অনুযায়ী উচ্চশিক্ষিত ছিলেন। এই বাহ্যিক শিক্ষাগত বৈশিষ্ট্যের উপর ভর করেই তারা হযরত মির্জা বশীরুদ্দীন মাহমুদ আহমদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-কে অবজ্ঞাসূচক ভঙ্গিতে কেবল "এম. এম. মাহমুদ" বলে সম্বোধন করত এবং তাঁর নেতৃত্বকে বুদ্ধিবৃত্তিকভাবে চ্যালেঞ্জ করত।

তাদের আচরণ ছিল অসহযোগিতা, শীতল উদাসীনতা ও সম্পূর্ণ বিমুখতায় পরিপূর্ণ। সে সময় তাদের অহংকার ও ঔদ্ধত্যের মাত্রা ইতিহাসে লিপিবদ্ধ কিছু বক্তব্য থেকেই অনুমান করা যায়। যেমন, ড. মির্জা ইয়াকুব বেগ অহংকারের সঙ্গে দাবি করেছিলেন:

"আমরা চলে যাচ্ছি, কিন্তু আগামী দশ বছরের মধ্যে কাদিয়ানের মাদরাসায় কেবল খ্রিস্টানই খ্রিস্টান থাকবে।"

অনুরূপভাবে আরেকজন প্রভাবশালী বিরোধী বলেছিল:

"আমরা চলে যাচ্ছি, কিন্তু তারা আমাদের নাক ঘষে অপমান সহকারে আবার ডাকবে।"

এমনকি এ কথাও প্রচার করা হয় যে, দশ বছরের মধ্যে মৌলভী মুহাম্মদ আলী সাহেব তাঁর সঙ্গীদের নিয়ে কাদিয়ান জয় করবেন এবং রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সদৃশ সম্মান ও মর্যাদা নিয়ে কাদিয়ানে প্রবেশ করবেন।

(খুতবাতে মাহমুদ, খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা ৯; আয়িনা-এ-সাদাকত, পৃষ্ঠা ১৮০)

এছাড়াও প্রকাশ্যে বলা হতে থাকে যে, চাঁদা বন্ধ হয়ে যাবে এবং যখন এরা না খেয়ে মরতে বসবে, তখন নিজেরাই বোধে আসবে। এসব অহংকারী বক্তব্যের জবাবে হযরত মুসলেহ মওউদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) দৃঢ় সংকল্পের সঙ্গে বলেন:

"আমার প্রভু আমার উপর এই ইলহাম নাজিল করেছেন-কে আছে যে আল্লাহর কাজসমূহকে থামাতে পারে?

(আনওয়ারুল উলূম, খণ্ড ১৫, পৃষ্ঠা ৫৯০; খিলাফতে রাশেদা)

অবশেষে তারা বড় বড় দাবি ও হুমকি দিয়ে স্থায়ী কেন্দ্র কাদিয়ান ত্যাগ করে চলে যায়। তারা বিদায় নেওয়ার সময় মাত্র ২৫ বছর বয়সী এক তরুণকে-যিনি ম্যাট্রিক পরীক্ষায় অকৃতকার্য ছিলেন-তুচ্ছতাচ্ছিল্য করে গেল। কিন্তু যেহেতু তাঁর পেছনে খোদায়ী সাহায্য ছিল, তাই অল্পদিনের মধ্যেই তাদের বোধোদয় ঘটে।

দশ দিনের মধ্যেই, অর্থাৎ ২৪ মার্চ ১৯১৪ সালে, তারা লাহোরে একটি সভা করে এবং সিদ্ধান্ত নেয় যে একটি প্রতিনিধি দল হযরত মুসলেহ মওউদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর কাছে পাঠানো হবে। তারা প্রস্তাব দেয় যে, তারা তাঁর নির্বাচনকে কেবল এ পর্যন্ত বৈধ মনে করে যে তিনি অ-আহমদিদের কাছ থেকে আহমদের নামে বায়'আত নিতে পারবেন; কিন্তু পুরোনো আহমদিদের কাছ থেকে নতুন করে বায়'আত নেওয়ার কোনো প্রয়োজন তারা মনে করে না। এই ভিত্তিতে তারা তাঁকে বায়'আত ছাড়াই একজন আমীর হিসেবে মানতে প্রস্তুত ছিল, তবে এই শর্তে যে, হযরত মসীহে মওউদ (আলাইহিস সালাম) যে অধিকার ও ক্ষমতা সদর আঞ্জুমান আহমদিয়্যাকে দিয়েছেন, তাতে তিনি কোনো হস্তক্ষেপ করতে পারবেন না।

(পরিশিষ্ট, আখবার পয়গামে সুলহ, ২ এপ্রিল ১৯১৪; আল-ফুরকান, মে-জুন ১৯৬৫, পৃষ্ঠা ২৪ থেকে উদ্ধৃত)

হযরত মুসলেহ মওউদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এই মনগড়া শর্তসাপেক্ষ আপোসের প্রস্তাব দৃঢ়তার সঙ্গে প্রত্যাখ্যান করেন। তাঁর নিজের ভাষায়-

"সাহিবজাদা সাহেবের পক্ষ থেকে যে উত্তর আমরা পেয়েছি, তা প্রমাণ করে যে তিনি এক ইঞ্চি তো দূরের কথা, এক হাজার ভাগের এক ভাগও নিজের অবস্থান থেকে সরে আসতে প্রস্তুত নন। ভবিষ্যতে কী করা হবে, তার সিদ্ধান্ত তখনই নেওয়া উচিত।"

(আখবার পয়গামে সুলহ, ৩১ মার্চ ১৯১৪; আল-ফুরকান, মে-জুন ১৯৬৫, পৃষ্ঠা ২৪)

যখন নম্রতার মাধ্যমে কিছু অর্জিত হলো না, তখন তারা আপোসের নামে কঠোরতা ও হুমকির পথ অবলম্বন করল। সে সময় আলীগড়ে বসবাসকারী শায়খ তায়মুর সাহেব-যিনি হযরত মুসলেহ মওউদের ঘনিষ্ঠ অনুরাগী ছিলেন-তাঁকে এই বিরোধীরা লিখে অনুরোধ করে যে, তিনি যেন এই 'ফিতনা' দূর করেন। তিনি টেলিগ্রাম পাঠিয়ে অবিলম্বে আপোস করার পরামর্শ দেন এবং ভয়াবহ পরিণতির আশঙ্কা প্রকাশ করেন। এর জবাবে হযরত মুসলেহ মওউদ লিখেন:

"তোমার পত্র আমার কাছে পৌঁছেছে। তুমি আমাকে এই লোকদের সঙ্গে আপস করার উপদেশ দিচ্ছ, কিন্তু আমার প্রভু আমার উপর এই ইলহাম নাজিল করেছেন-'কে আছে যে আল্লাহর কাজসমূহকে থামাতে পারে?' অতএব, আমি তাদের সঙ্গে আপস করতে পারি না তুমি খলীফাতুল মসীহ প্রথমের মুখে বহুবার আমার সম্পর্কে এমন কথা শুনেছ, যা থেকে বোঝা যায় যে তাঁর পরে আল্লাহ্ আমাকে খিলাফতের স্থানে দাঁড় করাবেন সুতরাং তোমার ওপর প্রমাণ পূর্ণ হয়ে গেছে, এবং আমাকে অস্বীকার করার মাধ্যমে তুমি নাস্তিকতা থেকে মুক্ত থাকতে পারবে না।"

এক মাসের মধ্যেই সে ব্যক্তি প্রকাশ্য নাস্তিকে পরিণত হয়।

(আনওয়ারুল উলূম, খণ্ড ১৫, পৃষ্ঠা ৫৬৩-৫৬৪)

মৌখিক হুমকির পর আইনি মামলার হুমকিও দেওয়া হয়। ডিসেম্বর ১৯১৪ সালে খাজা কামালুদ্দিন সাহেব "সিলসিলার অভ্যন্তরীণ মতভেদের কারণসমূহ" শিরোনামে একটি গ্রন্থ রচনা করেন, যেখানে মামলার হুমকি দেওয়া হয়। এ প্রসঙ্গে হযরত মুসলেহ মওউদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) লেখেন-

"মামলার হুমকির কথা তো এমনই, যা সব যুগেই সত্যবাদীদের দেওয়া হয়েছে কেউ যদি আমাকে আদালতে ডাকে বা আঞ্জুমানের বিরুদ্ধে মামলা করে, তাতে কী ক্ষতি? আমি এই দায়িত্ব কেবল আল্লাহর জন্যই গ্রহণ করেছি আমি জানি, পরিণাম অবশ্যই কল্যাণকর হবে; কারণ এটি আল্লাহর আমার সঙ্গে করা প্রতিশ্রুতি।"

(আল-কওলুল ফসল, আনওয়ারুল উলূম, খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ৩১১)

এ পর্যন্ত আলোচনা ছিল সেইসব বিরোধীদের নিয়ে, যারা হযরত মসীহে মওউদ (আলাইহিস সালাম)-কে সত্য বলে মানত। এরপর উল্লেখ করা হয় তাদের, যারা ছিলেন অস্বীকারকারী ও প্রত্যাখ্যানকারী। উলুল্-আজমের গুণ হযরত মুসষবয মওউদের জন্য স্বতন্ত্র ছিল না; বরং তা

(এরপর ১১ পাতায়...)

যুগ ইমামের বাণী

অতএব, কুরআন শরীফ অনুধাবন করা এবং সেই অনুযায়ী হিদায়াত লাভের জন্য তাকওয়া প্রধান ও আবশ্যক বিষয়।

(মালফুযাত, ৫ম খণ্ড, পৃ: ১২১)

দোয়াপ্রার্থী: Late-Rafiquddin Ahmad & Afifa Begum, From- Lutful Haque Sb., Kandi (MSD)

হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.)-এর পবিত্র জীবনী ও কর্মকাণ্ডের সংক্ষিপ্ত বিবরণ

হাফিজ সৈয়্যদ রসুল নিয়াজ, মুরুব্বী সিলসিলা নশর ইশাআত, কাদিয়ান

সৈয়দনা হযরত মসলেহে মওউদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর বরকতময় সত্তা বহু ভবিষ্যদ্বাণীর সমন্বয়ে গঠিত ছিল। এসব ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী, তিনি ২৫ বছর বয়সে খলীফাতুল মসীহ নির্বাচিত হন এবং পরবর্তীতে ৫২ বছর ধরে এই মহান দায়িত্ব নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করে যান।

আল্লাহ তাআলা ২০ ফেব্রুয়ারি ১৮৮৬ খ্রিস্টাব্দে হযরত মসীহে মউদ (আলাইহিস সালাম)-কে এক পবিত্র আত্মার অধিকারী, সৎ ও কোমল হৃদয়ের এক পুত্র সন্তানের জন্মের সংবাদ দেন, যাকে বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ জ্ঞান দ্বারা পরিপূর্ণ করা হবে এবং জানানো হয় যে, সে অবশ্যই নয় বছরের মধ্যে জন্মগ্রহণ করবে। এই ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী, সৈয়দনা হযরত মির্জা বশীরুদ্দীন মাহমুদ আহমদ সাহেব হযরত আম্মা জান নুসরত জাহান বেগমের গর্ভে শনিবার, ১২ জানুয়ারি ১৮৮৯ খ্রিস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। ঐশী ওহীতে তাঁর নাম রাখা হয় মাহমুদ, বশীর-এ-সানি এবং ফজল-এ-উমর; আর তাঁকে কালিমাতুল্লাহ ও ফখরে রুসুল উপাধিতেও ভূষিত করা হয়। যেহেতু হযরত মসীহে মউদ (আলাইহিস সালাম) তাঁর সম্পর্কে বহু সুসংবাদ লাভ করেছিলেন, তাই তিনি তাঁর প্রতি বিশেষ যত্ন নিতেন এবং কখনো তাঁকে বকাঝকা বা তিরস্কার করতেন না। শৈশব থেকেই তাঁর স্বভাবে দ্বীনের প্রতি গভীর আগ্রহ ছিল। তিনি দোয়ার প্রতি অত্যন্ত অনুরাগী ছিলেন এবং অত্যন্ত মনোযোগের সঙ্গে নামাজ আদায় করতেন। তিনি মাদ্রাসা তা'লীমুল ইসলাম থেকে প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করেন। শারীরিক দুর্বলতা ও দৃষ্টিশক্তির সমস্যার কারণে তাঁর শিক্ষাগত অগ্রগতি ভালো থাকেনি এবং প্রতিটি শ্রেণিতে তাঁকে রেয়াতসহ উত্তীর্ণ করা হতো। তিনি মিডল ও এন্ট্রান্স (ম্যাট্রিক) সরকারি পরীক্ষায় অকৃতকার্য হন এবং এভাবেই তাঁর দুনিয়াবি শিক্ষা সমাপ্ত হয়। ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী, আল্লাহ তাআলাই তাঁকে বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ জ্ঞান দান করেন, যার সাক্ষী বিশ্ববাসী। এই প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার পর হযরত খলীফাতুল মসীহ প্রথম (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তাঁকে নিজ বিশেষ তত্ত্বাবধানে গ্রহণ করেন। তিনি তিন মাসে তাঁকে কুরআন শরীফের অনুবাদ পড়িয়ে দেন এবং পরবর্তী তিন মাসে সহীহ বুখারী সম্পন্ন করান। কিছু চিকিৎসাশাস্ত্রও শেখান এবং কয়েকটি আরবি রিসালা পাঠ করান। যদিও কুরআনি জ্ঞানের উন্মোচন আল্লাহর বিশেষ দান, তথাপি একথা সত্য যে কুরআন শরীফের প্রতি গভীর অনুরাগ সৃষ্টি করেছিলেন হযরত খলীফাতুল মসীহ আওয়াল (রাযিয়াল্লাহু আনহু)। যখন তাঁর বয়স ১৭ বা ১৮ বছর ছিল, একদিন তিনি স্বপ্নে এক ফেরেশতাকে দেখেন, যিনি তাঁকে সূরা ফাতিহার তাফসীর শিক্ষা দেন। এরপর থেকে কুরআনের তাফসীরের জ্ঞান সরাসরি আল্লাহ তাআলাই তাঁকে দান করতে থাকেন।

১৯০৬ খ্রিস্টাব্দে, যখন তাঁর বয়স ১৭ বছর, সদর আঞ্জুমান আহমদিয়্যা প্রতিষ্ঠিত হলে হযরত মসীহে মউদ (আলাইহিস সালাম) তাঁকে মজলিসে মু'তামিদিন-এর সদস্য নিযুক্ত করেন। সৈয়দনা হযরত মির্জা বশীরুদ্দীন মাহমুদ আহমদ সাহেব মসলেহে মউদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর প্রাথমিক জীবনের অধ্যয়ন থেকেই স্পষ্ট হয় যে আল্লাহ তাআলা তাঁকে দ্বীনের খেদমতের জন্য গভীর আগ্রহ, উদ্দীপনা ও উদ্যম দান করেছিলেন এবং দৃঢ় সংকল্প ও অটল ইচ্ছাশক্তির সঙ্গে তিনি যুগের মসীহের মিশনের এক সৈনিক হয়ে উঠেছিলেন। ২৬ মে ১৯০৮ খ্রিস্টাব্দে যখন হযরত মসীহে মউদ (আলাইহিস সালাম) ইন্তেকাল করেন, তখন তাঁর বয়স ছিল মাত্র উনিশ বছর। প্রিয় ইমামের বিচ্ছেদে শোকের এক পাহাড় তাঁর ওপর ভেঙে পড়ে। কিন্তু এই ভয়াবহ আঘাতের মুহূর্তেও তিনি নিজেকে সামলে নেন এবং শোকে বিহ্বল হয়ে বসে না থেকে সম্ভাব্য বিরোধিতা ও তার মোকাবিলার জন্য নিজেকে প্রস্তুত করেন। তিনি নিজেই বলেন-

"আমি ঠিক সেই স্থানে হযরত মসীহে মউদ (আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম)-এর শিয়রের পাশে দাঁড়িয়ে বলেছিলাম: হে আল্লাহ! আমি তোমাকে সর্বদ্রষ্টা ও সর্বব্যাপী জেনে আন্তরিকতার সঙ্গে তোমার সামনে এই অঙ্গীকার করছি যে, যদি সমগ্র জামাআতে আহমদিয়া থেকেও সবাই ফিরে যায়, তবুও হযরত মসীহে মউদ (আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম)-এর মাধ্যমে তুমি যে বার্তা অবতীর্ণ করেছ, আমি তা বিশ্বের কোণে কোণে ছড়িয়ে দেব। আমার দেহের প্রতিটি কণাই এই অঙ্গীকারে শরিক ছিল এবং সে সময় আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতাম যে, পৃথিবী তার সমস্ত শক্তি ও ক্ষমতা একত্র করলেও আমার এই অঙ্গীকার ও সংকল্পের সামনে তার কোনো বাস্তবতা থাকবে না।"

(খুতবা জুমআ, ১৮ ফেব্রুয়ারি ১৯৪৪; খুতবাতে মাহমুদ, খণ্ড ২৫, পৃ. ১৩৪)

মানুষ অনেক সময় আবেগের বশবর্তী হয়ে সাময়িকভাবে এমন অঙ্গীকার করে ফেলে, কিন্তু পরবর্তীতে তা পালন করতে পারে না এবং সময়ের ঘূর্ণিতে তা ভুলে যায়। কিন্তু হযরত মসলেহে মউদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর জীবনের প্রতিটি দিনই এই সত্যের সাক্ষ্য দেয় যে, তিনি জীবনের শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত অসাধারণ দৃঢ়তার সঙ্গে তাঁর এই অঙ্গীকার পালন করেছেন।

এই অঙ্গীকার তাঁর অদম্য সংকল্প ও দ্বীনি গায়রতের এক উজ্জ্বল প্রমাণ। ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে, তিনি এ অঙ্গীকার অত্যন্ত সুন্দরভাবে পালন করেছেন। ১৫ বা ১৬ বছর বয়সে প্রথমবার তিনি এই ইলহাম লাভ করেন:

إِنَّ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ

(নিশ্চয়ই যারা তোমার অনুসরণ করবে, তারা কিয়ামত পর্যন্ত কাফিরদের উপর বিজয়ী থাকবে)।

এই প্রথম ইলহামেই এ সুসংবাদ নিহিত ছিল যে, একদিন তিনি জামাআতের ইমাম হবেন। কুরআন শরীফের গভীর উপলব্ধি তাঁকে আল্লাহর পক্ষ থেকে বিশেষ দান হিসেবে প্রদান করা হয়েছিল, যা তাঁর বিভিন্ন ভাষণে-বার্ষিক জলসা বা অন্যান্য উপলক্ষে-প্রকাশ পেত। কুরআনের এই আয়াত لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ অনুযায়ী এটি ছিল এই সত্যের প্রমাণ যে, প্রিয় সৈয়দনা মাহমুদের হৃদয়ে আল্লাহ, তাঁর রসুল এবং তাঁর পবিত্র কালামের ভালোবাসা ছাড়া আর কিছুই ছিল না। কিন্তু আফসোস হিংসা ও বিদ্বেষের জন্য! খিলাফতের অস্বীকারকারীরা তাঁর বিরুদ্ধেও ষড়যন্ত্র করতে থাকত এবং চেষ্টা করত যেন কোনোভাবে হযরত খলীফাতুল মসীহ প্রথম (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর মনে তাঁর সম্পর্কে সন্দেহ সৃষ্টি হয়। তাদের শত্রুতার প্রথম কারণ ছিল এই যে, তিনি হযরত খলীফাতুল মসীহ প্রথমের পরিপূর্ণ আনুগত্যশীল ছিলেন, তাঁর ডান হাত ও শক্তিশালী সহায়ক ছিলেন। দ্বিতীয়ত, তাঁর তাকওয়া ও পবিত্রতা, আল্লাহর সঙ্গে গভীর সম্পর্ক, দোয়ার কবুলিয়াত এবং ক্রমবর্ধমান জনপ্রিয়তার কারণে তারা দেখতে পাচ্ছিল যে, জামাআতের মধ্যে তাঁর গ্রহণযোগ্যতা ও জনপ্রিয়তা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং স্বয়ং হযরত খলীফাতুল মসীহ প্রথমও তাঁকে অত্যন্ত সম্মান করতেন। এসব কারণেই তাঁর সত্তা খিলাফত অস্বীকারকারীদের জন্য কাঁটার মতো বিঁধে থাকত।

খিলাফতে উলার সময়ে তিনি ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল এবং আরব দেশসমূহ ও মিশর সফর করেন এবং বাইতুল্লাহর হজ আদায়ের সৌভাগ্য লাভ করেন। ১৯১১ খ্রিস্টাব্দে তিনি মজলিস আনসারুল্লাহ প্রতিষ্ঠা করেন এবং ১৯১৩ খ্রিস্টাব্দে পত্রিকা আল-ফজল প্রকাশ করেন, যার সম্পাদকীয় দায়িত্ব তিনি তাঁর খিলাফতের সময়কালজুড়ে অত্যন্ত দক্ষতা ও যোগ্যতার সঙ্গে পালন করেন।

হযরত খলীফাতুল মসীহ প্রথম (রাযিয়াল্লাহু আনহু) কঠিন অসুস্থতার কারণে ২৭ ফেব্রুয়ারি ১৯১৪ খ্রিস্টাব্দে জুমার নামাজের পর ডোলিতে চড়ে হযরত নবাব মুহাম্মদ আলী খান সাহেব (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর কোঠী দারুস সালাম-এ গমন করেন। সৈয়দনা মাহমুদও দিন-রাত ওই কোঠীতেই (বর্তমান আল-নূর প্রদর্শনী ভবন) অবস্থান করতে থাকেন এবং তাঁর অধিকাংশ সময় হযরত খলীফাতুল মসীহ প্রথমের সেবায় অতিবাহিত হতো। হযরত খলীফাতুল মসীহ প্রথম (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর দূরদর্শী দৃষ্টি তাঁর অসুস্থতার দিনগুলোতে তাঁর প্রাচীন রীতি অনুযায়ী নিজের স্থানে নামাজের ইমামতি ও জুমার খুতবা প্রদানের জন্য হযরত মির্জা বশীরুদ্দীন মাহমুদ আহমদ সাহেবকে নিযুক্ত করেছিল।

হযরত খলীফাতুল মসীহ প্রথম (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর ইন্তেকালের পর ১৪ মার্চ ১৯১৪ খ্রিস্টাব্দে মসজিদ নূরে খিলাফতে সানিয়ার নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। সে সময় উপস্থিত প্রায় দুই থেকে আড়াই হাজার ব্যক্তি খিলাফতের হাতে বায়'আত করেন। প্রায় পঞ্চাশ জন ব্যক্তি বায়'আত করেননি এবং মতবিরোধের পথ অবলম্বন করেন। মতবিরোধকারীদের মধ্যে মওলভী মুহাম্মদ আলী সাহেব এবং খাজা কামালুদ্দীন সাহেব-যারা নিজেদেরকে আন্দোলনের স্তম্ভ বলে মনে করতেন-অগ্রভাগে ছিলেন। খিলাফত অস্বীকার করা এবং হাবলুল্লাহর অবমূল্যায়নের পরিণতি এই দাঁড়ায় যে, এরা কাদিয়ান থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে, সদর আঞ্জুমান আহমদিয়্যা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়, নেজামে ওসিয়ত থেকে বিচ্ছিন্ন হয় এবং হযরত মসীহে মউদ (আলাইহিস সালাম)-এর নবুয়ত অস্বীকার করে। জনগণের

মহান আল্লাহর বাণী

এবং লোকদের মধ্যে কতক এমন আছে যাহারা আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভের জন্য নিজেদের আত্মাকে বিক্রয় করিয়া দেয়, এবং নিশ্চয় আল্লাহ্ এইরূপ বান্দাগণের প্রতি অত্যন্ত মমতাশীল। (আল-বাকারা: ২০৮)

দোয়াপ্রার্থী: Wasia Begum, Harhari, Murshidabad

মধ্যে গ্রহণযোগ্যতা অর্জনের আশায় তারা নিজেদের বহু আকীদা ও মতবাদ পরিবর্তন করতে বাধ্য হয়, কিন্তু তাও তাদের ভাগ্যে জোটেনি।

হযরত খলীফাতুল মসীহ সানী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) নিজেই এই অবস্থার বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেন-

"আমার বায়'আতের শব্দগুলো মনে ছিল না এবং আমি এটিকে অজুহাত বানাতে চেয়েছিলাম তখন মৌলভী সরওয়ার শাহ সাহেব বললেন, 'আমি বায়'আতের শব্দগুলো বলে যাব, আপনি বায়'আত নিন।' তখন আমি বুঝলাম যে এটাই আল্লাহ তাআলার অভিপ্রায়। অতঃপর আমি তাঁর অভিপ্রায় গ্রহণ করলাম এবং লোকদের কাছ থেকে বায়'আত গ্রহণ করলাম।"

(আয়িনা-এ-সাদাকত, পৃষ্ঠা ১৯০-১৯১)

জামাআতের সদস্যদের প্রতি তাঁর ভালোবাসা ছিল অসাধারণ। এটি এক বাস্তব সত্য যে, জামাআতের সদস্যরা তাঁর কাছে তাঁর স্ত্রী, সন্তান ও আত্মীয়স্বজনের চেয়েও অধিক প্রিয় ছিলেন। তাদের আনন্দে তিনি আনন্দিত হতেন এবং তাদের দুঃখে তিনি গভীর কষ্ট অনুভব করতেন। যখন তিনি খলীফা নির্বাচিত হন, তখন একই বছরে জলসা সালানায় ভাষণ প্রদান করে তিনি বলেন-

"তোমাদের মধ্যে এবং তাদের মধ্যে-যারা খিলাফত থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে-কি কোনো পার্থক্য নেই? এক বিরাট পার্থক্য আছে। তোমাদের জন্য এমন একজন ব্যক্তি আছে, যে তোমাদের ব্যথা অনুভব করে, তোমাদের ভালোবাসে, তোমাদের দুঃখকে নিজের দুঃখ মনে করে, তোমাদের কষ্টকে নিজের কষ্ট মনে করে এবং তোমাদের জন্য আল্লাহর দরবারে দোয়া করে। কিন্তু তাদের জন্য এমন কেউ নেই। সে তোমাদের জন্য চিন্তা করে, ব্যথা অনুভব করে এবং তোমাদের জন্য নিজ প্রভুর সামনে কাতর হয়ে থাকে-কিন্তু তাদের জন্য এমন কেউ নেই। কারো যদি একটি মাত্র রোগী থাকে, তবুও তার শান্তি থাকে না; তাহলে তোমরা কল্পনা করতে পারো সেই ব্যক্তির অবস্থা, যার হাজার নয় বরং লক্ষ লক্ষ রোগী রয়েছে।"

(বরকাতে খিলাফত, আনওয়ারুল উলূম, খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ১৫৬)

১৭ মার্চ ১৯১৪ খ্রিস্টাব্দে তিনি মসজিদ আকসা কাদিয়ানে দরসুল কুরআন শুরু করেন। ২০ মার্চ ১৯১৪ খ্রিস্টাব্দে খিলাফতে সানিয়ার প্রথম জুমার খুতবা প্রদান করেন। ১০ এপ্রিল ১৯১৪ খ্রিস্টাব্দে খিলাফতে সানিয়ার অধীনে সদর আঞ্জুমান আহমদিয়্যার প্রথম সভা তাঁর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। ১২ এপ্রিল তিনি "মর্যাদা-এ-খিলাফত"বিষয়ে ভাষণ প্রদান করেন। জুন মাসে তিনি দাক্ষিণাত্যের নিজামকে তাবলীগের উদ্দেশ্যে "তোহফাতুল মুলূক" গ্রন্থ রচনা করেন।

মার্চ ১৯১৫ খ্রিস্টাব্দে সিলোনে এবং জুন মাসে মরিশাসে জামাআতে আহমদিয়্যার মিশন প্রতিষ্ঠিত হয়। একই বছরে খ্যাতনামা, নিষ্ঠাবান ও খেদমতে দ্বীনকারী হযরত শেঠ আব্দুল্লাহ আল-দীন সাহেব, সেকেন্দ্রাবাদ দাক্ষিণাত, জামাআতে আহমদিয়্যায় যোগদান করেন। মার্চ ১৯১৬ খ্রিস্টাব্দে হযরত মসীহে মউদ (আলাইহিস সালাম)-এর বড় ভাই মির্জা গুলাম কাদির সাহেবের বিধবা হুরমত বিবি (তাই সাহেবা) বায়'আত করে আহমদিয়্যা আন্দোলনে অন্তর্ভুক্ত হন, যার মাধ্যমে "তাই আই"ইলহাম পূর্ণতা লাভ করে।

২৪ ফেব্রুয়ারি ১৯১৭ খ্রিস্টাব্দে হযরত সাহেবজাদা মির্জা নাসির আহমদ সাহেবের খতমে কুরআনের উপলক্ষে আমীন অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। একই বছরে ২১ জুন তিনি কাদিয়ানে নূর হাসপাতালের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। ১ জানুয়ারি ১৯১৯ খ্রিস্টাব্দে তিনি আঞ্জুমান আহমদিয়্যায় নেজারতসমূহের ব্যবস্থা প্রবর্তন করেন। ২৬ ফেব্রুয়ারি ১৯১৯ খ্রিস্টাব্দে তিনি লাহোরের হাবীবিয়া হলে "ইসলামে মতভেদের সূচনা"বিষয়ক এক মহাগুরুত্বপূর্ণ বক্তৃতা প্রদান করেন। একই বছরে জুন মাসে কাদিয়ানে একটি এতিমখানা প্রতিষ্ঠিত হয়।

১৫ ফেব্রুয়ারি ১৯২০ খ্রিস্টাব্দে হযরত মুফতি মুহাম্মদ সাদিক সাহেব (রাযিয়াল্লাহু আনহু) আমেরিকায় মিশন প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে ফিলাডেলফিয়ার বন্দরে অবতরণ করেন, কিন্তু তাঁকে প্রথমে শহরে প্রবেশ করতে দেওয়া হয়নি। তবে মে মাসে তিনি আমেরিকায় প্রবেশ করে তাবলীগ করার অনুমতি লাভ করেন। ৭ জুন ১৯২০ খ্রিস্টাব্দে তিনি লন্ডনের মসজিদ আহমদিয়্যার জন্য চাঁদা সংগ্রহের আন্দোলন শুরু করেন এবং জমি ক্রয়ের পর ৯ সেপ্টেম্বর কাদিয়ানে এক আনন্দঘন অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়।

২২ আগস্ট ১৯২১ তারিখে তিনি (রা) কাশ্মীরে গমন করেন এবং হযরত ঈসা (আ.)-এর মাজারে দোয়া করেন। ১৫-১৬ এপ্রিল ১৯২২ তারিখে আহমদিয়া মুসলিম জামা'আতের প্রথম স্থায়ী মজলিসে শূরা অনুষ্ঠিত হয়। ১২ জুলাই ১৯২৪ তারিখে তিনি (রা) প্রথম ইউরোপ সফরের উদ্দেশ্যে কাদিয়ান থেকে রওনা হন। ১৭ আগস্ট তিনি (রা) ইতালির প্রধানমন্ত্রী বেনিতো মুসোলিনি-র সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। ২২ আগস্ট তিনি প্রথমবারের মতো লন্ডনে আগমন করেন। ৯ সেপ্টেম্বর তিনি "ইস্ট অ্যান্ড ওয়েস্ট"ইউনিয়নের সভায় তাঁর প্রথম ইংরেজি বক্তৃতা প্রদান করেন। ২৩ সেপ্টেম্বর ওয়েম্বলি কনফারেন্সে তাঁর প্রবন্ধ "আহমদিয়্যাত, বা প্রকৃত ইসলাম"হযরত চৌধুরী মুহাম্মদ জাফরুল্লাহ খান (রা) পাঠ করে শোনান। ১৯ অক্টোবর হুযূর (রা) ফজল মসজিদ, লন্ডন-এর ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন এবং ২৪ নভেম্বর প্রথম ইউরোপ সফর সমাপ্ত করে কাদিয়ানে প্রত্যাবর্তন করেন।

জানুয়ারি ১৯২৬ সালে কাদিয়ানে টেলিগ্রাফ অফিসের উদ্বোধন উপলক্ষে হুযূর (রা)-এর পক্ষ থেকে প্রেরিত প্রথম টেলিগ্রাম ভারতের কয়েকটি খ্যাতনামা জামা'আতের নামে পাঠানো হয়। ৩ অক্টোবর স্যার শেখ আব্দুল কাদির সাহেব ফজল মসজিদ, লন্ডন উদ্বোধন করেন। একই বছরে প্রথমবারের মতো আহমদি নারী সদস্যদের বার্ষিক জলসা শুরু হয়। ২০ মে ১৯২৮ তারিখে হুযূর (রা) জামিয়া আহমদিয়া উদ্বোধন করেন। ১৭ জুন হুযূর (রা)-এর উদ্যোগে ভারতের সর্বত্র প্রথমবারের মতো ইয়াওমে সীরাতুন্নবী (সা.) অত্যন্ত জাঁকজমকের সঙ্গে পালিত হয়। ১৯ ডিসেম্বর প্রথমবারের মতো কাদিয়ানে রেলগাড়ি পৌঁছে; সেই রেলে ভ্রমণ করে হুযূর (রা) বহু সহচরসহ অমৃতসর থেকে কাদিয়ানে আগমন করেন।

ডিসেম্বর ১৯৩০ সালে হযরত সাহিবজাদা মির্জা সুলতান আহমদ সাহেব, হযরত মসীহে মওউদ (আ.)-এর পুত্র, আহমদিয়াতে দাখিল হন। ২৫ জুলাই ১৯৩১ তারিখে হযরত খলিফাতুল মসীহ দ্বিতীয় (রা) অল ইন্ডিয়া কাশ্মীর কমিটির সভাপতি নির্বাচিত হন। ১ জানুয়ারি ১৯৩৩ তারিখে হুযূর (রা) প্রথমবারের মতো বিমান ভ্রমণ করেন।

২৩ নভেম্বর ১৯৩৪ তারিখে তিনি (রা) তেহরিকে জাদিদের সূচনা ঘোষণা করেন। ২ মার্চ হুযূর (রা) কাদিয়ানে দারুস্-সান'আত উদ্বোধন করেন। ১৪ ডিসেম্বর ১৯৩৬ তারিখে কাদিয়ানে টেলিফোন সেবার উদ্বোধন উপলক্ষে তিনি (রা) হযরত চৌধুরী স্যার মুহাম্মদ জাফরুল্লাহ খান (রা)-এর সঙ্গে কথোপকথন করেন। ৭ জানুয়ারি ১৯৩৮ তারিখে প্রথমবারের মতো হুযূর (রা) মসজিদ আকসায় লাউড স্পিকারের মাধ্যমে জুমার খুতবা প্রদান করেন। ১ অক্টোবর ১৯৩৮ তারিখে একটি রু'য়ার (স্বপ্নদর্শন) ভিত্তিতে হুযূর (রা) হায়দরাবাদ দাক্ষিণে সফর শুরু করেন। এ সফর সম্পর্কে পরে তিনি "সাইরে রুহানি"(আধ্যাত্মিক সফর) শিরোনামে মহান বক্তৃতাসমূহ প্রদান করেন। ৩ ডিসেম্বর ১৯৩৯ তারিখে সারা বিশ্বের জামা'আতের পক্ষ থেকে প্রথমবারের মতো "ইয়াওমে পেশোয়ায়ানে মাযাহিব"(ধর্মীয় নেতৃবৃন্দের দিবস/সর্বধর্ম সম্মেলন দিবস) অত্যন্ত উদ্দীপনা ও উৎসাহের সঙ্গে পালিত হয়। ২৮ ডিসেম্বর ১৯৩৯ তারিখে তাঁর খিলাফতের ২৫ বছর পূর্তি উপলক্ষে জুবিলি অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। এই জলসায় হুযূর (রা) প্রথমবারের মতো লিওয়া-এ আহমদিয়্যাত উত্তোলন করেন; এরপর খুদ্দামুল আহমদিয়া-র পতাকা এবং নারী জলসা ময়দানে লাজনা ইমাউল্লাহ-র পতাকা উত্তোলিত হয়।

২৬ জানুয়ারি ১৯৪০ তারিখে হুযূর (রা) প্রবর্তিত হিজরি শামসি বর্ষপঞ্জি প্রথমবারের মতো আল-ফজল পত্রিকায় প্রকাশিত হয় এবং পরবর্তীতে এই বর্ষপঞ্জিই জামা'আতে প্র?ি?ত হয়। ১৯৪৩ সালে হুযূর (রা) ইফতা কমিটি গঠন করেন। ২৮ জানুয়ারি ১৯৪৪ তারিখে আল্লাহর আদেশে হুযূর (রা) কাদিয়ানে প্রথমবারের মতো মুসলেহ মওউদের ভবিষ্যদ্বাণীর মিসদাক হওয়ার দাবি ঘোষণা করেন এবং ২৯ জানুয়ারি কাদিয়ানে প্রথমবারের মতো ইয়াওমে মুসলেহ মওউদ পালিত হয়। ৪ জুন ১৯৪৪ তারিখে হুযূর (রা) তালিমুল ইসলাম কলেজ, কাদিয়ান উদ্বোধন করেন। ২৬, ২৭ ও ২৮ ডিসেম্বর ১৯৪৬ তারিখে অখণ্ড ভারতের শেষ বার্ষিক জলসা অনুষ্ঠিত হয়, যেখানে উপস্থিতির সংখ্যা ছিল ৩৯,৭০০।

৩১ আগস্ট ১৯৪৭ তারিখে হুযূর (রা) কাদিয়ান থেকে পাকিস্তানে হিজরত করে লাহোরে পৌঁছান। ৫ আগস্ট ১৯৪৮ তারিখে সদর আঞ্জুমান আহমদিয়া পাকিস্তান সরকারের নিকট থেকে রাবওয়ার জমির দখল গ্রহণ করে এবং ২০ সেপ্টেম্বর রাবওয়া উদ্বোধিত হয়। ১৫, ১৬ ও ১৭ এপ্রিল ১৯৪৯ তারিখে রাবওয়ায় প্রথম বার্ষিক জলসা অনুষ্ঠিত হয়। ৩১ মে ১৯৫০ তারিখে হুযূর (রা) কয়েকটি কেন্দ্রীয় ভবনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। ২১ মে ১৯৫১ তারিখে রাবওয়ায় টেলিফোন সেবা চালু হয়; প্রথম কলটি কাদিয়ানের আমীর, আহমদিয়া জামা'আত-এর নিকট করা হয়, যেখানে হুযূর (রা) জামা'আতকে সালাম জানান, অসুস্থদের খোঁজখবর নেন এবং দোয়ার প্রতি উদ্বুদ্ধ করেন। ১০ মার্চ ১৯৫৪ তারিখে রাবওয়ার মসজিদ মুবারকে আসর নামাজের পর আব্দুল হামিদ নামক এক ব্যক্তি হুযূর (রা)-এর উপর হত্যা চেষ্টা চালায়। ৭ অক্টোবর ১৯৫৪ তারিখে হযরত চৌধুরী স্যার মুহাম্মদ জাফরুল্লাহ খান (রা) আন্তর্জাতিক বিচার আদালতের সভাপতি নির্বাচিত হন। ২৯ এপ্রিল ১৯৫৫ তারিখে হুযূর (রা) দ্বিতীয় ইউরোপ

সফরের জন্য করাচি থেকে রওনা হন এবং ২৮ সেপ্টেম্বর রাবওয়ায় প্রত্যাবর্তন করেন। ৭ জুলাই ১৯৫৭ তারিখে জামি'আতুল মুবাশশিরীন-কে জামিয়া আহমদিয়া-র সঙ্গে একীভূত করা হয়। ডিসেম্বর ১৯৫৭ মাসে হুযূর (রা) ওয়াক্‌ফে জাদিদের তহরিক ঘোষণা করেন। ১৯৬৪ সালে হযরত খলিফাতুল মসীহ দ্বিতীয় (রা)-এর খিলাফতের পঞ্চাশ বছর পূর্তি উপলক্ষে জামা'আতের সদস্যবৃন্দ আল্লাহ তাআলার দরবারে কৃতজ্ঞতার দোয়া করেন এবং সারা বিশ্বে বিস্তৃত আহমদিরা নবায়ন বায়'আত করেন।

৭ ও ৮ নভেম্বর ১৯৬৫-এর মধ্যবর্তী রাতে, প্রায় রাত ২টায়, ৭৭ বছর বয়সে হযরত খলিফাতুল মসীহ দ্বিতীয় (রা) তাঁর প্রকৃত প্রভুর সান্নিধ্যে প্রত্যাবর্তন করেন। আর বিষয়টি নির্ধারিত ছিল।

তাঁর ইন্তেকালের সংবাদ ছড়িয়ে পড়ামাত্র নিকট ও দূর থেকে হাজার হাজার আহমদি রাবওয়ায় আসতে শুরু করেন। পরদিন জামা'আত একত্রিত হয়ে নতুন ইমাম নির্বাচন করে এবং হযরত মির্জা নাসির আহমদ সাহেব (রহ.)-কে খলিফা হিসেবে বায়'আত করে। ৯ নভেম্বর সন্ধ্যায় তাঁর জানাজা বেহেশতি মকবরায় নেওয়া হয়, যেখানে হযরত মির্জা নাসির আহমদ সাহেব, খলিফাতুল মসীহ তৃতীয় (রহ.) অসংখ্য আহমদির সঙ্গে তাঁর নামাজে জানাজা পড়ান। তাঁর মাজার তাঁর মাতা হযরত সাইয়্যিদা নুসরাত জাহান বেগম সাহেবার কবরের পাশেই নির্মিত হয়।

খাজা হাসান নিজামী সাহেব বলেন:

"তিনি প্রায়ই অসুস্থ থাকতেন, কিন্তু অসুস্থতা তাঁর কর্মতৎপরতাকে ব্যাহত করতে পারেনি। বিরোধিতার ঝড়ের মধ্যেও তিনি শান্তভাবে কাজ করে তাঁর মুঘলীয় বীরত্ব প্রমাণ করেছেন। তদুপরি, মুঘল বংশের মধ্যে কার্যকর শাসন-কৌশলের একটি বিশেষ দক্ষতা বিদ্যমান। তিনি রাজনৈতিক প্রজ্ঞার অধিকারী, ধর্মীয় বুদ্ধি ও উপলব্ধিতে দৃঢ়, এবং যুদ্ধবিদ্যাতেও পারদর্শী-অর্থাৎ তিনি মানসিক ও কলমের যুদ্ধের এক দক্ষ যোদ্ধা।" (আখবার 'আদিল, দিল্লি, ২৪ এপ্রিল ১৯৩৩; বদর, ৬ ফেব্রুয়ারি ২০০২-এর সূত্রে)

ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী হুযূর (রা) অসাধারণ জ্ঞানগত কীর্তি সম্পাদন করেন-অগণিত বক্তৃতা ও ভাষণ প্রদান করেন এবং তাফসিরে কাবির, তাফসিরে সগীর এবং আনওয়ারুল উলূম গ্রন্থসমূহসহ বহু কিতাব রচনা করেন। জামা'আতির প্রশিক্ষণ ও উদ্দেশ্য উৎকৃষ্টভাবে বাস্তবায়নের জন্য তিনি পাঁচটি সহযোগী সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেন: লাজনা ইমাউল্লাহ, নাসিরাতুল আহমদিয়া, মজলিস আনসারুল্লাহ, মজলিস খুদ্দামুল আহমদিয়া, এবং আতফালুল আহমদিয়া।

তাঁর স্ত্রীদের বিবরণ নিম্নরূপ:

(১) হযরত সাইয়্যিদা মাহমূদা বেগম সাহেবা (রা)

(২) হযরত সাইয়্যিদা আমাতুল-হাই বেগম সাহেবা (রা)

(৩) হযরত সাইয়্যিদা মারিয়াম বেগম সাহেবা (রা)

(৪) হযরত সাইয়্যিদা সারাহ বেগম সাহেবা

(৫) হযরত সাইয়্যিদা আজিজা বেগম সাহেবা

(৬) হযরত সাইয়্যিদা মারিয়াম সিদ্দিকা বেগম সাহেবা

(৭) হযরত সাইয়্যিদা বুশরা বেগম সাহেবা

হযরত খলিফাতুল মসীহ পঞ্চম (আবা) আমাদের দায়িত্বের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেন:

"এখন আমাদেরও কাজ হলো-নিজ নিজ পরিসরে সংস্কারক হওয়ার চেষ্টা করা। আমাদের জ্ঞান, আমাদের কথা ও আমাদের কাজের মাধ্যমে ইসলামের সুন্দর বার্তা সর্বত্র ছড়িয়ে দাও। আত্মশুদ্ধির দিকে মনোযোগ দাও, সন্তানদের সংশোধনের দিকে মনোযোগ দাও এবং সমাজ সংস্কারের দিকেও মনোযোগ দাও। আর এই সংস্কার ও বার্তাকে দুনিয়ায় প্রতিষ্ঠা করার জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা করো-যার উৎস আল্লাহ তাআলা পবিত্র নবী (সা.)-কে করেছেন। অতএব, যদি আমরা এই চিন্তাধারা নিয়ে জীবন যাপন করি, তবে আমরা ইয়াওমে মুসলেহ মওউদের হক আদায়কারী হবো।" (খুতবাতে মাসরূর, খণ্ড ৯, পৃ. ৯১-৯২)

সম্মানিতা সাহিবজাদি আমাতুল কুদ্দুস বেগম সাহেবা (রা) তাঁর কাব্যে সুন্দরভাবে বলেন:

আল্লাহ নিজেই তাঁকে "ফজলে উমর"নামে ডেকেছিলেন;

উমরের ন্যায় গাম্ভীর্য ও সেই একই শৌর্য তিনি লাভ করেছিলেন।

তিনি ছিলেন আসমানি নূর, যা জমিনে নেমে এসেছিল;

কলিমাতুল্লাহ হওয়ার সৌভাগ্য তিনি অর্জন করেছিলেন।

এক পবিত্র ও মহিমান্বিত পুত্রের সংবাদ আল্লাহ নিজেই দিয়েছিলেন;

কী অনন্য বুদ্ধিমত্তা ও মর্যাদা তিনি লাভ করেছিলেন!

যাঁর বুদ্ধি ও প্রজ্ঞার সাক্ষ্য আল্লাহ নিজেই দিয়েছেন-

তিনি ছিলেন প্রখর বুদ্ধিসম্পন্ন, তিনি ছিলেন দূরদর্শী।

(কাব্য: সম্মানিতা সাহিবজাদি আমাতুল কুদ্দুস বেগম সাহেবা)

আল্লাহ তাআলা আমাদের সকলকে হযরত মুসলেহ মওউদ (রা)-এর প্রত্যাশা অনুযায়ী ইসলাম ও আহমদিয়্যাতের শিক্ষার উপর আমল করার এবং সমগ্র বিশ্বে তা প্রচার করার তাওফিক দান করুন। আমীন।

আনওয়ারুল উলূম

হযরত মির্জা বশীরুদ্দীন মাহমুদ আহমদ, মুসলেহ মওউদ, খলীফাতুল মসীহ দ্বিতীয় (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর রচনাবলীর সংকলন

হযরত মসীহে মওউদ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) তুলনামূলকভাবে অল্প বয়সেই নেতৃত্ব ও ইমামতের আসনে অধিষ্ঠিত হন, এবং তাঁর খিলাফতের মেয়াদ অর্ধশতাব্দীরও অধিক সময়ব্যাপী বিস্তৃত ছিল। এই দীর্ঘ সময়ে তিনি তাঁর লিখনী ও বক্তৃতার মাধ্যমে গভীর জ্ঞান ও আধ্যাত্মিক প্রজ্ঞায় বিশ্বকে সমৃদ্ধ করেন। তিনি জামাআতের উন্নতি ও কল্যাণ, শৃঙ্খলা ও সংগঠন, ঐক্য ও সম্প্রীতির জন্য মহান পরিকল্পনা প্রণয়ন করেন এবং সেগুলো সফলভাবে বাস্তবায়ন করেন। সহায়ক সংগঠন প্রতিষ্ঠা ও বিভিন্ন আন্দোলন শুরু করে তিনি প্রতিটি পদক্ষেপে দিকনির্দেশনা প্রদান করেন-ফলে আল্লাহ্ তাআলার অনুগ্রহে আজ পৃথিবীর কোথাও আহমদিয়াতের সূর্য অস্ত যায় না। সংকটপূর্ণ মুহূর্তে তিনি মুসলিম উম্মাহকে পথনির্দেশ দেন; আর অমুসলিম জাতি ও সমগ্র মানবজাতির জন্যও তিনি তাঁর সুদূরপ্রসারী চিন্তা ও দৃষ্টিভঙ্গির কারণে এক মূল্যবান সহায়ক ও উপকারক হিসেবে প্রতীয়মান হন।

ফযল-এ-উমর ফাউন্ডেশন এই মহান ও প্রতিশ্রুত নেতার ১৯০৬ থেকে ১৯৬১ সাল পর্যন্ত বিস্তৃত-সংখ্যায় শতাধিক-লেখনী ও বক্তৃতা বিভিন্ন বিচ্ছিন্ন উৎস থেকে সংগ্রহ করে একটি সুসংবদ্ধ সংকলনরূপে উপস্থাপন করেছে। এই সংকলনের নাম আনওয়ারুল উলূম, যা মোট ২৬ খণ্ডে বিভক্ত।

আল্লাহ্ তাআলা আমাদের সবাইকে এই বরকতময় সংকলন থেকে পরিপূর্ণভাবে উপকৃত হওয়ার তৌফিক দান করুন।

খুতবাতে মাহমুদ

হযরত মুসলেহ মওউদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর খুতবাগুলি জ্ঞান ও মারেফতের এক অমূল্য ভাণ্ডার এবং ভবিষ্যদ্বাণীর এই ঐশী বাণীর জীবন্ত সাক্ষ্য- "তাকে বাহ্যিক ও অন্তর্গত জ্ঞানে পরিপূর্ণ করা হবে।" তাঁর খিলাফতের যুগ অর্ধশতাব্দীরও অধিক সময়ব্যাপী-একটি ইতিহাস-সৃষ্টিকারী অধ্যায়। এই অত্যন্ত সফল ও দীর্ঘ সময়কালে তিনি জুমআর খুতবার মাধ্যমে জামাআতের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক প্রশিক্ষণে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। রাজনৈতিক, সামাজিক ও ধর্মীয় অঙ্গনে উদ্ভূত প্রতিটি বিষয়ে তিনি সময়োপযোগী ও সঠিক দিকনির্দেশনা প্রদান করেন। সংক্ষেপে বলতে গেলে, এই জুমআর খুতবাগুলি আহমদিয়া মুসলিম জামাআতের এক অতি মূল্যবান সম্পদ ও পুঁজি, যা সংকলিত হয়ে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়েছে।

ওড়না-পরিহিত নারীদের জন্য ফুল

নারীদের উদ্দেশে প্রদত্ত ভাষণসমূহের সংকলন

নিজ খিলাফতের সময়কালে হযরত মসীহে মওউদ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) নারীদের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক প্রশিক্ষণের লক্ষ্যে বিভিন্ন সমাবেশে বহু ভাষণ প্রদান করেন। এসব ভাষণের ভেতর জ্ঞানের সমৃদ্ধ ভাণ্ডার নিহিত রয়েছে। কোথাও তিনি তাঁদের আধ্যাত্মিক জ্ঞানের সঙ্গে পরিচিত করিয়েছেন, কোথাও আত্মসংশোধন ও সন্তান প্রতিপালনের ওপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন; কখনো তাঁদের জাতীয় দায়িত্বের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন, আবার কোথাও সন্তানের সুষ্ঠু লালন-পালনের নীতিমালা ব্যাখ্যা করেছেন; এবং কোথাও তাঁদের সুপ্ত সক্ষমতাকে জাগ্রত ও বিকশিত করার প্রচেষ্টা নিয়েছেন। সর্বদিক থেকেই এসব ভাষণ পথপ্রদর্শক আলোকবর্তিকা হিসেবে কাজ করে।

এই ভাষণসমূহের সংকলনটিও হুযূর (রাদিয়াল্লাহু আনহু)-এর নিজস্ব আকাঙ্ক্ষা পূরণের উদ্দেশ্যে প্রস্তুত করা হয়েছে। কেননা তিনি একবার বলেছিলেন-

"এর জন্য প্রশিক্ষণ প্রয়োজন; শুধু বক্তৃতার মাধ্যমে এ কাজ সম্পন্ন হতে পারে না। এর জন্য দরকার জাতির জন্য একটি কার্যকর দিকনির্দেশনা-একটি গ্রন্থ প্রস্তুত করা, যেখানে লেখা থাকবে নারীদের কীভাবে সন্তানদের লালন-পালন করা উচিত, যাতে নারীরা তা পড়ে সে অনুযায়ী আমল করতে পারে। নতুবা এমনটা সম্ভব নয় যে কেউ কেবল আল-ফযল ও রিভিউ পত্রিকার ফাইল নিজের কাছে রেখে এই উদ্দেশ্য অর্জন করতে পারবে।

একজন সুবক্তা হিসেবে হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.)

আতহার আহমদ শামিম, ম্যানেজার বদর, বদর পত্রিকা

নিজের বাগ্মীতাশক্তির উল্লেখ করতে গিয়ে হযরত মসলেহ মওউদ (রযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন-

"আল্লাহ তা'আলা হযরত মসীহ মওউদ (আলাইহিস সালাম)-কে 'সুলতানুল কলম' (কলমের সম্রাট) ঘোষণা করেছিলেন। তার বিপরীতে তিনি আমাকে এমন বিপুলভাবে কথা বলার সুযোগ দিয়েছেন যে তিনি আমাকে 'সুলতানুল বয়ান' (বক্তৃতার সম্রাট) বানিয়ে দিয়েছেন।"

(খুতবাতে মাহমুদ, খণ্ড ২, পৃ. ৩৩৪; ২৩ সেপ্টেম্বর ১৯৫০, তা'লিমুল ইসলাম কলেজ, লাহোর)

কোথায় খুঁজবে, কোথায় পাবে?

হে বয়ানের সম্রাট, এ কেমন আপনার বক্তৃতাশৈলী!

ভূমিকা

হযরত মির্জা মাহমুদ আহমদ, খলিফাতুল মসীহ দ্বিতীয়, মুসলেহ মওউদ (রযিয়াল্লাহু আনহু)-এর দৃষ্টিতে বক্তৃতা কেবল শব্দসমষ্টি নয়; বরং তা চিন্তা ও চেতনার এক প্রবহমান নদী-যার তরঙ্গে যুক্তির শক্তিও আছে, বাগ্মীতার মাধুর্যও আছে। যখন তিনি ভাষণের মিম্বরে অধিষ্ঠিত হতেন, শব্দগুলো যেন তাঁর কল্পনার অধীন হয়ে যেত, আর অর্থসমূহ তাঁর কণ্ঠের মর্যাদায় নতুন পোশাক পরিধান করত। তাঁর বক্তব্যে এমন এক জাদুকরী ছন্দ ছিল যা শ্রোতাদের হৃদয়কে বশীভূত করত, আর এমন এক যৌক্তিক গভীরতা ছিল যা বুদ্ধি ও বিবেককে নতুন দিগন্তের সঙ্গে পরিচিত করাত। নিঃসন্দেহে, তাঁর প্রকাশভঙ্গি ছিল আরবি বাগ্মীতা ও ফারসি সাবললীতার এক অপূর্ব সঙ্গম-আধুনিক যুগে বক্তৃতাশিল্পের এক উজ্জ্বল নিদর্শন। তিনি যে বহুবিধ বিষয়ে আলোচনা করেছেন, তা তাঁর বাগ্মীতার দক্ষতাকেই প্রতিফলিত করে-যেন উপরিউক্ত কাব্যিক পঙ্‌ক্তিটি তাঁর বক্তব্যেরই প্রতিচ্ছবি।

পরম মহান আল্লাহ সাইয়্যিদুনা হযরত আকদাস মসীহ-মওউদ (আলাইহিস সালাম)-কে প্রাচুর্যের সঙ্গে এমন সব ভবিষ্যদ্বাণীতে ভূষিত করেছিলেন, যেগুলো সত্যতা ও মহিমায় দিবালোকের মতো প্রকাশ্য হয়ে ওঠে এবং তাঁর মামুরিয়াতের অটল নিদর্শন হয়ে দাঁড়ায়। এসব সমর্থনসূচক নিদর্শনের মধ্যে একটি ভবিষ্যদ্বাণী তার অলৌকিক মহিমায় অনন্য-যা বিশ্ব ইতিহাসে 'মুসলেহ মওউদ'-এর ভবিষ্যদ্বাণী নামে স্মরণীয়।

ওহির মাধ্যমে প্রতিশ্রুত মসীহ (আলাইহিস সালাম)-কে সেই মহান সন্তানের সুসংবাদ দেওয়া হয়, যিনি ইসলামের সত্যতার এক জীবন্ত নিদর্শন হবেন। এই পূর্ণাঙ্গ ভবিষ্যদ্বাণীতে হযরত মসলেহ মওউদ (রযিয়াল্লাহু আনহু)-এর সম্পর্কে বাহান্নটি গুণাবলীর সংবাদ দেওয়া হয়েছে, যা তাঁকে অন্যদের থেকে পৃথক করে।

এই প্রবন্ধের সঙ্গে সম্পর্কিত ভবিষ্যদ্বাণীর কয়েকটি পঙ্‌ক্তি নিম্নরূপ-

"তিনি হবে শান-শওকত, মহিমা ও সম্পদের অধিকারী। তিনি পৃথিবীতে আসবেন এবং তাঁর মসীহী আত্মা ও রূহুল কুদুসের বরকতে অনেককে রোগব্যাধি থেকে মুক্ত করবেন তিনি হবেন অত্যন্ত বুদ্ধিমান ও প্রজ্ঞাবান, আর হৃদয়ে কোমল। তাঁকে বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ জ্ঞানে পরিপূর্ণ করা হবে তাঁর আগমন হবে অতি বরকতময় এবং তা হবে ঐশী মহিমার প্রকাশের কারণ আমরা তাঁর মধ্যে আমাদের রূহ সঞ্চার করব এবং আল্লাহর ছায়া তাঁর মাথার ওপর থাকবে পৃথিবীর প্রান্তসীমা পর্যন্ত তাঁর খ্যাতি পৌঁছাবে এবং জাতিসমূহ তাঁর মাধ্যমে বরকত লাভ করবে।

(ঘোষণা, ২০ ফেব্রুয়ারি ১৮৮৬; মজমু'আ ইশতিহারাত, খণ্ড ১, পৃ. ১০১-১০২)

এই ভবিষ্যদ্বাণীতে উল্লিখিত প্রতিটি বাক্যই স্বয়ং একটি মহান ভবিষ্যদ্বাণী। সেই প্রতিশ্রুত সন্তানের মহত্ত্বের কথা চিন্তা করুন-যিনি এসব গুণাবলির পূর্ণ প্রতিফলন ছিলেন। জগতের দৃষ্টিতে এক ব্যক্তির মধ্যে এমন উচ্চতর গুণাবলির সমাবেশ অসম্ভব মনে হতে পারে; কিন্তু এটি ছিল সেই সর্বশক্তিমান, পরাক্রমশালী রবের বাণী ও ভবিষ্যদ্বাণী-যাঁর কাছে কিছুই অসম্ভব নয়। আল্লাহ যা চেয়েছেন, শেষ পর্যন্ত তাই বাস্তবায়িত হয়েছে।

ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে অসংখ্য বাধা ও প্রতিকূল অবস্থার মধ্যেও এসব ভবিষ্যদ্বাণী অক্ষরে অক্ষরে পূর্ণ হয়েছে। পৃথিবী নিজ চোখে দেখেছে, আর আপন-পর ও বন্ধু-শত্রু সকলেই এ সত্যের সাক্ষ্য দিয়েছে যে পবিত্র মসীহ (আলাইহিস সালাম)-এর পরিবারে জন্ম নেওয়া সেই "প্রতিশ্রুত পুত্র"বাস্তবেই "মুসলেহ মওউদ"রূপে পূর্ণ জৌলুসে বিশ্বমঞ্চে আবির্ভূত হয়েছিলেন। ঐশী বাণীতে তাঁর যে বৈশিষ্ট্যসমূহ বর্ণিত ছিল, তাঁর ব্যক্তিত্বে সেগুলোর পূর্ণ প্রতিফলন দেখা যায়। আল্লাহর সাহায্য ও সমর্থনের ছায়া সর্বদা তাঁর সঙ্গে ছিল। তিনি অসাধারণ গতিতে উন্নতির সোপান অতিক্রম করেন, ভবিষ্যদ্বাণীর প্রতিটি দিক যথাযথভাবে পূর্ণ করে সাফল্যের সঙ্গে এ দুনিয়া ত্যাগ করেন। তাঁর মহিমা চিরকাল তাঁর শুভ স্মৃতিকে জীবিত রাখবে; কেননা তিনি ছিলেন দয়ালু আল্লাহর ক্ষমতার এক মহান নিদর্শন। আর এ এক স্বীকৃত সত্য যে রব্বানি নিদর্শনের জাঁকজমক কখনো ম্লান হয় না।

স্নেহময় কথনভঙ্গি ও মোহময় ভাষণ

হযরত মসলেহ মওউদ (রযিয়াল্লাহু আনহু)-এর ব্যক্তিত্ব ছিল ভালোবাসা, প্রাণবন্ততা ও অপরিসীম করুণার এক সুন্দর সংমিশ্রণ, যা সকল মতের মানুষকে প্রভাবিত করেছিল। তিনি কেবল এক মহান নেতা নন; বরং এক স্নেহশীল মুরব্বি ছিলেন-যিনি শিশু থেকে বৃদ্ধ পর্যন্ত জামা'আতের প্রত্যেক সদস্যের সঙ্গে গভীর সম্মান ও ভালোবাসায় আচরণ করতেন। তাঁর কাছে মানবিক মর্যাদা ছিল অগ্রাধিকার; তাই তিনি সর্বদা অন্যের আত্মসম্মান রক্ষা করতেন এবং কাউকেই তুচ্ছ জ্ঞান করতেন না। তাঁর প্রশিক্ষণপদ্ধতি ছিল দৃঢ় ও নীতিনিষ্ঠ, তবে তার ভিত্তি ছিল নিখাদ ভালোবাসা ও পারস্পরিক সম্মান।

তাঁর কথোপকথন যেমন ছিল গাম্ভীর্য ও প্রজ্ঞায় পরিপূর্ণ, তেমনি তাতে ছিল এমন এক মধুরতা যা ধীরে ধীরে হৃদয়ে প্রবেশ করত। কুরআন তিলাওয়াত হোক বা ভাষণ-তাঁর কণ্ঠের আবেগ ও বয়ানশৈলী শ্রোতাদের ওপর এক আত্মিক মুগ্ধতা সৃষ্টি করত। তাই তাঁর ভাষণ ঘণ্টার পর ঘণ্টা চলত, তবু শ্রোতারা সর্বাঙ্গীণ মনোযোগে শুনে যেতেন এবং সময়ের প্রবাহ টেরই পেতেন না।

শারীরিক অসুস্থতা থেকে কুরআনি জ্ঞানের মহাসাগর

শৈশবের অবস্থা ও পরবর্তী বৈজ্ঞানিক-বুদ্ধিবৃত্তিক মর্যাদার তুলনা করলে মানববুদ্ধি বিস্মিত হয়ে যায়। চোখের দীর্ঘস্থায়ী সমস্যাসহ যকৃতের অসুখের কারণে তিনি নিয়মিত প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা গ্রহণে সক্ষম হননি; এমনকি শিক্ষকেরা তাঁর দুর্বল স্বাস্থ্য ও হাতের লেখার কথা দেখে পড়াশোনা বন্ধ করার পরামর্শও দিয়েছিলেন। কিন্তু ঐশী বিধান ছিল ভিন্ন। সেই দুর্বল স্বাস্থ্যধারী শিশুই মাত্র এগারো বছর বয়সে 'আঞ্জুমান তাশহীযুল আজহান'-এর মঞ্চে দাঁড়িয়ে কুরআনি জ্ঞান ও গভীর তত্ত্বজ্ঞান এমনভাবে উপস্থাপন করেন যে বড় বড় আলেম ও চিন্তাবিদ বিস্ময়ে হতবাক হয়ে যান। এটাই ছিল সেই মহান ভবিষ্যদ্বাণীর প্রথম প্রকাশ-যে তিনি "বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ জ্ঞানে পরিপূর্ণ" হবেন।

এই ঐতিহাসিক ভাষণ সম্পর্কে কাদিয়ানের হযরত ভাই আবদুর রহমান সাহেব (রযিয়াল্লাহু আনহু) তাঁর অনুভূতি প্রকাশ করে বলেন-

"সে ভাষণ ছিল জ্ঞান ও মারিফতের এক নদী এবং আধ্যাত্মিকতার এক সমুদ্র। ভাষণ শেষ হলে হযরত মাওলানা নূরুদ্দীন (রযিয়াল্লাহু আনহু) দাঁড়িয়ে এর ভূয়সী প্রশংসা করেন। বয়ানের শক্তি ও সাবলীলতার প্রশংসা করেন। কুরআনি বিষয়বস্তু ও সূক্ষ্ম যুক্তির জন্য আন্তরিকতা ও ভালোবাসার সঙ্গে 'মারহাবান, জাযাকাল্লাহ' বলে দোয়া করেন এবং অত্যন্ত সম্মানের সঙ্গে বাড়ি পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে বিদায় জানান।"

(সাপ্তাহিক বদর, কাদিয়ান, ৬ ফেব্রুয়ারি ২০০২)

হযরত মসলেহ মওউদ (রযিয়াল্লাহু আনহু)-এর জ্ঞান ও চিন্তাজীবন ছিল এতই বিস্তৃত ও বহুমাত্রিক যে তিনি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও বৈচিত্র্যময় বিষয়ে বহু স্মরণীয় ভাষণ প্রদান করেন এবং অসংখ্য অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন প্রবন্ধ রচনা করেন। সৌভাগ্যক্রমে, এর অধিকাংশই আজও সংরক্ষিত-যা তাঁর গভীর চিন্তা ও বিস্তৃত অধ্যয়নের প্রমাণই নয়, বরং তাঁর সর্বাঙ্গীণ ব্যক্তিত্বের প্রতিচ্ছবি। এসব লেখা ও ভাষণ আজও জ্ঞান ও মারিফতের সন্ধানী আত্মাদের জন্য এক দিশারি মিনার।

একই জাদুময় বয়ান ও আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্বের চিত্র অঙ্কন করে সাহেবজাদা মির্জা মুযাফফর আহমদ সাহেব হযরত মসলেহ মওউদ (রযিয়াল্লাহু আনহু)-এর স্বতন্ত্র বক্তৃতাশৈলী ও "সুলতানুল বয়ান-এর অবস্থাকে এভাবে বর্ণনা করেন-

"হুযূরের ব্যক্তিত্বে ছিল প্রবল চৌম্বকীয় আকর্ষণ। তিনি যখন কোনো বিষয়ে কথা বলতেন, তখন তার বিভিন্ন দিক অত্যন্ত সুন্দরভাবে উন্মোচিত করতেন। তাঁর কণ্ঠ ছিল ভীষণ গম্ভীর ও আশ্চর্যজনকভাবে আকর্ষণীয়। আমি প্রায়ই ভাবতাম-এমন জ্ঞানসমৃদ্ধ, গাম্ভীর্যপূর্ণ কণ্ঠ শুনে কি কেউ জামা'আতের বাইরে

যুগ ইমামের বাণী

খোদা তোমাদের সঙ্গে থাকবেন, যদি তোমরা মুত্তাকি হও এবং তাকওয়ার সূক্ষ্ম পথসমূহে বিচরণ কর।

(মালফুযাত, ১ম খণ্ড, পৃ: ২০০)

দোয়াপ্রার্থী: Sk.Fayjal Sb. and Family, Jaynagar, Bankura, WB

থাকতে পারে? একবার জলসা সালানায় হুযূর ভাষণ দিচ্ছিলেন। প্যান্ডেলের বাইরে কিছু লোক দাঁড়িয়ে শুনছিল। হুযূর থেমে বললেন–ভেতরে জায়গা আছে, বাইরে যারা আছেন তারা ভেতরে আসুন। কিন্তু তারা আসেনি। কিছুক্ষণ পর হুযূর ভাষণের মধ্যে বললেন–আমাকে জানানো হয়েছে বাইরে যারা আছেন তারা আহমদী নন। তারা বলে–আমরা মির্জা সাহেবের ভাষণ শুনতে চাই, কিন্তু ভেতরে ঢুকতে চাই না। ভেতরে জাদু আছে–ভয় হয় আমরা বায়'আত করে ফেলব। হুযূর বললেন–যদি কোনো জাদু থাকে, তা আমার কণ্ঠেই আছে; আর সেই কণ্ঠ তো বাইরে পর্যন্ত পৌঁছাচ্ছে।"

(হযরত মসলেহ মওউদ–এর স্মৃতিতে, দৈনিক আল–ফজল ইন্টারন্যাশনাল, ২ মে ২০২৪)

এই ঘটনা হযরত মসলেহ মওউদ (রযিয়াল্লাহু আনহু)–এর সেই "সুলতানুল বয়ান"ও আকর্ষণীয় কণ্ঠের এক জীবন্ত সাক্ষ্য–যার মায়াজালে শ্রোতারা অজান্তেই আবদ্ধ হয়ে পড়তেন। তাঁর কণ্ঠে ছিল এমন এক গাম্ভীর্য ও আকর্ষণ যা হৃদয়ের গভীরে প্রবেশ করত। "যদি কোনো জাদু থাকে, তা আমার কণ্ঠেই–এই উক্তি আসলে তাঁর সেই খোদাপ্রদত্ত বাগ্মীতাশক্তির স্বীকৃতি, যার সামনে প্যান্ডেলের ভেতর–বাইরের সবাই অসহায় হয়ে পড়ত। তাঁর ভাষণের প্রভাব এতটাই ছিল যে বিরোধীরাও ভয়ে কানে আঙুল দিত–পাছে এই কণ্ঠ তাদের বিশ্বাসের ভিত নড়িয়ে দেয় এবং তারা বায়'আতে বাধ্য হয়ে যায়। তাই মানুষের মুখে মুখে রটে যায়–"ভেতরে কোনো জাদু চলছে।" এই জাদু ছিল আসলে সেই "প্রতিশ্রুত পুত্রের চৌম্বকীয় ব্যক্তিত্ব, যাকে আল্লাহ 'ফসাহাত ও বালাগাত' এর সর্বোচ্চ স্তরে অধিষ্ঠিত করেছিলেন। যারা প্যান্ডেলের ভেতরে থাকতেন, তারা দুনিয়া ও দুনিয়ার সব প্রয়োজন ভুলে ঘণ্টার পর ঘণ্টা তাঁর বয়ানের মুক্তা কুড়োতে থাকতেন। এই অতুলনীয় বক্তৃতাশক্তি ও প্রভাবই বিশ্বকে স্বীকার করতে বাধ্য করে–

এক উচ্চমার্গের বক্তা

তাঁর এই অতুলনীয় বাগ্মিতা ও গভীর প্রভাব বিশ্বকে স্বীকার করিয়েছে যে সত্যিকারের মহান বক্তা তিনিই–যিনি নিজের শব্দ দিয়ে শ্রোতাদের হৃদয় স্পর্শ করেন এবং জটিলতম সত্যকেও সহজভাবে উপস্থাপন করতে পারেন। হযরত মসলেহ মওউদ (রযিয়াল্লাহু আনহু)–এর বক্তব্যে ছিল এমন এক অসাধারণ প্রভাব, চিন্তার স্বচ্ছতা ও আবেগের ভারসাম্য–যা কেবল যুক্তি দিয়ে মনকে সন্তুষ্ট করত না, বরং আত্মাকেও নতুন উদ্দীপনায় ভরিয়ে দিত।

সম্মানিত সাহেবজাদা মির্জা মুযাফফর আহমদ সাহেব, আমির জামা'আত আহমদিয়া যুক্তরাষ্ট্র বলেন–

"হুযূর ছিলেন সর্বোচ্চ মানের বক্তা। আমি সারা বিশ্বে বহু ভ্রমণ করেছি এবং বহু স্বনামধন্য নেতার ভাষণ শোনার সুযোগ পেয়েছি; কিন্তু বক্তৃতায় হুযূরের ধারেকাছেও কাউকে পাইনি। সত্যিই বলা যায়–তিনি তাঁর ভাষণ দিয়ে পাহাড় কাঁপাতে পারতেন। হাজার নয়, লক্ষাধিক জামা'আত সদস্য এ সত্যের সাক্ষী। তিনি শ্রোতাদের জাদুময় আবেশে বেঁধে রাখতেন। হিজরতের পরপরই তিনি পাকিস্তানের বিভিন্ন সমস্যা ও সমাধান নিয়ে বিভিন্ন শহরে বক্তৃতা দেন। ইসলামিয়া কলেজের এক অধ্যাপক, যিনি আমার এক বন্ধুর পাশে বসেছিলেন, স্বতঃস্ফূর্তভাবে বলে ওঠেন–'হুযূরের পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হওয়া উচিত।' এর আগেও 'ইসলামে মতভেদের সূচনা' বিষয়ে বক্তৃতার সময় ইসলামিয়া কলেজের ইতিহাস বিভাগের অধ্যাপক তাঁকে শ্রদ্ধা জানিয়ে বলেন–'যোগ্য পিতার যোগ্য পুত্র।' তিনি আরও বলেন–আমি নিজেকে ইসলামী ইতিহাসে জ্ঞানী মনে করতাম; কিন্তু আপনার ভাষণ শোনার পর বুঝলাম আমি তো একেবারেই নবীন ছাত্র।"

ইসলামিয়া কলেজ, লাহোর:

ঐতিহাসিক যৌক্তিক বিজয়

হযরত মসলেহ মওউদ (রযিয়াল্লাহু আনহু)–এর "সুলতানুল বয়ান–এর এক মহৎ প্রকাশ ছিল ইসলামিয়া কলেজ, লাহোরে 'মার্টিন হিস্টোরিক্যাল সোসাইটি'–র আয়োজনে প্রদত্ত তাঁর স্মরণীয় ভাষণ–"ইসলামে মতভেদের সূচনা।" ইসলামী ইতিহাসে তাঁর দখল এতটাই পূর্ণ ও পাণ্ডিত্যপূর্ণ ছিল যে খ্যাতনামা ঐতিহাসিকরাও বিস্মিত হয়ে যান।

এই পাণ্ডিত্যপূর্ণ ভাষণ সম্পর্কে সাইয়্যেদ আবদুল কাদির সাহেব (এম.এ., অধ্যাপক, ইসলামিয়া কলেজ, লাহোর) লেখেন–

"যোগ্য পিতার যোগ্য পুত্র হযরত মির্জা বশীরুদ্দীন মাহমুদ আহমদ সাহেব–এই নামই প্রমাণ করে যে এ ভাষণ অত্যন্ত পাণ্ডিত্যপূর্ণ। আমি দৃঢ়তার সঙ্গে বলতে পারি–খুব কম ঐতিহাসিকই হযরত উসমান (রযিয়াল্লাহু আনহু)–এর যুগের গৃহযুদ্ধের প্রকৃত কারণ পর্যন্ত পৌঁছাতে পেরেছেন। হযরত মির্জা সাহেব কেবল সেসব কারণ বুঝতেই সক্ষম হননি, বরং অত্যন্ত স্পষ্ট ও যুক্তিপূর্ণভাবে সেগুলো উপস্থাপন করেছেন। আমার ধারণা–ইসলামী ইতিহাসে আগ্রহীদের সামনে এমন সুসংগঠিত প্রবন্ধ আগে কখনো আসেনি।"

(ইসলামে মতভেদের সূচনা, ভূমিকা, প্রকাশিত নভেম্বর ১৯৩০)

আহমদিয়া হোস্টেল, লাহোরে এক ভাষণ

ইসলামের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা বিষয়ে লাহোরের আহমদিয়া হোস্টেলে হুযূরের এক ভাষণ অনুষ্ঠিত হয়।

"এই ভাষণ প্রায় আড়াই ঘণ্টা ধরে চলে। আহমদী বন্ধুদের পাশাপাশি হাজার হাজার মুসলিম ও অমুসলিম গণ্যমান্য ব্যক্তি এতে অংশ নেন। তাঁরা ছিলেন শিক্ষিত–অহমদী মুসলিম ও অন্যান্য অমুসলিম, যাদের অধিকাংশই উচ্চশিক্ষিত শ্রেণির, পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ও ছাত্রছাত্রীদের অন্তর্ভুক্ত। ভাষণের সময় অধ্যাপক, আইনজীবী ও অন্যান্য জ্ঞানী ব্যক্তিরা ঘন ঘন নোট নেন।"

(আনওয়ারুল উলূম, খণ্ড ১৮, 'ইসলামের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা' গ্রন্থের পরিচিতি, পৃ. ১)

"শ্রোতারা এমন আগ্রহ নিয়ে ভাষণটি শোনেন যে এত দীর্ঘ সময় তারা এমনভাবে বসে থাকেন–যেন তাদের মাথায় পাখি বসে আছে। টানা আড়াই ঘণ্টার ভাষণ ছিল এটি। এক অধ্যাপক ভাষণ শুনে কেঁদে ফেলেন; আর কমিউনিজমপন্থী কিছু ছাত্র বলেন–তারা 'ইসলামী সমাজতন্ত্র'–এ বিশ্বাসী হয়ে গেছেন এবং একে সঠিক ও যথার্থ মনে করেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের কিছু এম.এ. ছাত্র এ ভাষণটির ইংরেজি অনুবাদ করে অধ্যাপকদের কাছে পাঠানোর ইচ্ছা প্রকাশ করেন।"

(আনওয়ারুল উলূম, খণ্ড ১৮, পৃ. ২–৩)

তৎকালীন সময়ে ব্রিটিশ শাসন ছিল এবং অনেক অধ্যাপকই ছিলেন ইংরেজ। তাঁরা আরও বলেন–ভারতের ভবিষ্যৎ উন্নতি ও কল্যাণের জন্য যেখানে নানা পরিকল্পনা উপস্থাপিত হচ্ছে, সেখানে হুযূর যে ইসলামী ব্যবস্থা তুলে ধরেছেন তা মুসলমানদের চিন্তার প্রতিনিধিত্ব করবে।

এই সভার সভাপতিত্ব করেন মিস্টার রামচাঁদ মচন্ধা সাহেব, অ্যাডভোকেট, হাইকোর্ট লাহোর। মহিমান্বিত ভাষণের পর সভাপতি সংক্ষিপ্ত বক্তব্যে বলেন–

"আমি আমার অমুসলিম বন্ধুদের বলব–এমন ইসলামের প্রতি সম্মান ও মর্যাদা প্রদর্শনে আপনাদের কী আপত্তি থাকতে পারে? আপনারা যে গাম্ভীর্য ও শান্তির সঙ্গে আড়াই ঘণ্টা হুযূরের ভাষণ শুনেছেন–যদি কোনো ইউরোপীয় তা দেখত, তবে সে বিস্মিত হতো যে ভারত এতদূর অগ্রসর হয়েছে।"

ওয়েম্বলি ধর্মীয় সম্মেলন

এই সম্মেলনে ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব ও সত্যতা বিষয়ে হুযূরের প্রস্তুতকৃত মহাকাব্যিক প্রবন্ধটি Ahmadiyyat or the True Islam (আহমদিয়্যাত–অর্থাৎ প্রকৃত ইসলাম) নামে বিশ্বব্যাপী খ্যাতি লাভ করে। এতে ইসলামের মৌলিক শিক্ষাসমূহ তাদের প্রজ্ঞা ও দর্শনসহ অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী ও যুক্তিপূর্ণভাবে উপস্থাপিত হয়। বিস্তারিততার কারণে নির্ধারিত সময়ে তা পাঠ করা সম্ভব না হওয়ায় হুযূর একটি সংক্ষিপ্ত প্রবন্ধ প্রস্তুত করেন, যার ইংরেজি অনুবাদ "অযসধফরুধ গড়াবসবহঃ"নামে প্রকাশিত হয় এবং সম্মেলনে হুযূরের নির্দেশে চৌধুরী স্যার মুহাম্মদ যাফরুল্লাহ খান (রযিয়াল্লাহু আনহু) তা পাঠ করেন। হুযূর তাঁর সব সঙ্গীসহ ওই অধিবেশনে উপস্থিত ছিলেন।

উল্লেখযোগ্য যে, চৌধুরী সাহেব প্রবন্ধ পাঠের জন্য উঠতে গেলে হুযূর তাঁর কানে ফিসফিস করে বলেন–"ভয় পেয়ো না, আমি দোয়া করব।" ইংরেজি ভাষায় পারদর্শী অভিজ্ঞ বক্তা হওয়া সত্ত্বেও এই কথাগুলো তাঁর জন্য আরও বেশি ঐশী সহায়তা ও আত্মবিশ্বাসের উৎস হয়। শ্রোতারা মনোযোগ দিয়ে শুনে যান, এবং শেষে অধিবেশনের সভাপতি মিস্টার থিওডোর মরিসন বলেন–

"আমার বেশি কিছু বলার প্রয়োজন নেই। প্রবন্ধের উৎকর্ষ ও সৌন্দর্য নিজেই কথা বলেছে। আমার পক্ষ থেকে এবং শ্রোতাদের পক্ষ থেকে আমি খলিফাতুল মসীহকে সুন্দর বিন্যাস, উৎকৃষ্ট চিন্তা ও উচ্চমানের যুক্তির জন্য ধন্যবাদ জানাই। শ্রোতাদের মুখাবয়ব নীরবে আমার মতের সঙ্গে একমত–এবং আমি নিশ্চিত যে তাদের পক্ষ থেকে কৃতজ্ঞতা প্রকাশে আমি যথার্থই প্রতিনিধিত্ব করছি।"

(আল–ফজল, ১৮ নভেম্বর ১৯২৪)

তুলনামূলক ধর্মতত্ত্বে পারদর্শী এক খ্যাতনামা ফরাসি পণ্ডিত প্রবন্ধটি শুনে স্বতঃস্ফূর্তভাবে বলে ওঠেন–

"Well put, well arranged, well dealt."

(খুব সুন্দরভাবে বলা হয়েছে, সুন্দরভাবে সাজানো হয়েছে এবং সুন্দরভাবে উপস্থাপিত হয়েছে।)

অনেকের মুখে শোনা যায়–

"Rare addresses-one cannot hear such addresses every day."

(এমন বিরল ভাষণ–প্রতিদিন শোনা যায় না।)

হুযূরের "সুলতানুল বয়ান–এর এমনই অবস্থা ছিল যে

এরপর শেষের পাতায়..

জুমআর খুতবা

"আমাদের বেহেশত আমাদেরই ঈশ্বর; আমাদের সর্বোচ্চ আনন্দসমূহ আমাদের ঈশ্বরেই নিহিত, কারণ আমরা তাঁকে দেখেছি এবং সকল সৌন্দর্যই তাঁর মধ্যেই বিদ্যমান। এই সম্পদ লাভ করার যোগ্য, যদিও তা প্রাণ বিসর্জনের বিনিময়ে অর্জিত হয়; আর এই লালমণি ক্রয় করার যোগ্য, যদিও তা সম্পূর্ণ অস্তিত্ব হারিয়ে পাওয়া যায়। হে বঞ্চিতরা! এই ঝরনার দিকে দৌড়াও, কেননা এটি তোমাদের তৃষ্ণা নিবারণ করবে। এটাই সেই জীবন-নিঃসৃত ঝরনা, যা তোমাদের রক্ষা করবে। আমি কী করব এবং কীভাবে এই সুসংবাদ হৃদয়ের মধ্যে প্রতিষ্ঠা করব? কোন ঢোল বাজিয়ে আমি বাজারে ঘোষণা করব যে-এই তোমাদের ঈশ্বর-যাতে লোকেরা শুনতে পায়? আর কোন ওষুধ দ্বারা আমি চিকিৎসা করব, যাতে শোনার জন্য মানুষের কান খুলে যায়? (মসীহ মওউদ আলাইহিস সালাম)

এই যুগে, হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা (সা.)-এর সত্যনিষ্ঠ গোলামের কার্যকলাপে এবং তাঁর প্রভুর আনুগত্য ও অনুসরণে আমরা এই ঐশী ভালোবাসারই এক ঝলক দেখতে পাই।

"আমার অবস্থা এমন যে, যদি আমি স্পষ্ট কণ্ঠে শুনতাম-'তুমি প্রত্যাখ্যাত এবং তোমার কোনো কামনাই পূর্ণ করা হবে না'-তবুও আল্লাহ তা'আলার কসম, এই ঐশী প্রেম, এই ভালোবাসা এবং দ্বীনের খিদমতে কোনো প্রকার ঘাটতি ঘটত না। কারণ আমি তো তাঁকে দেখেছি।" (হযরত মির্জা গোলাম আহমদ, আলাইহিস সালাম)

"সর্বাধিক প্রিয় সত্তা আল্লাহ তা'আলার প্রতি যে প্রেম তাঁর আত্মা ও দেহের প্রতিটি কণায় কণায় তরঙ্গায়িত ছিল, তা তাঁর প্রতিটি কথা ও কাজে সর্বদা সুস্পষ্টভাবে প্রতিফলিত হতো। নামাযের নির্ধারিত সময়ের বাইরেও আমি তাঁকে গভীর আকুলতায় তাঁর দয়ালু রবকে ডাকতে শুনেছি।"

(হযরত সাইয়্যিদা নবাব মুবারাকা বেগম সাহিবা রাদিয়াল্লাহু আনহা-এর বর্ণনা)

নিজ প্রভু হযরত মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর অনুসরণে তিনি শৈশব ও যৌবনকাল থেকেই আল্লাহ তা'আলার ভালোবাসায় নিজের সময় অতিবাহিত করেছেন।

"যখনই আমার ডালহৌসি যাওয়ার সুযোগ হতো, পাহাড়ের সবুজ তৃণভূমি ও প্রবাহিত পানির ধারা দেখে আমার অন্তরে স্বতঃস্ফূর্তভাবে আল্লাহ তা'আলার হামদের জোয়ার সৃষ্টি হতো এবং ইবাদতে এক বিশেষ স্বাদ অনুভূত হতো। আমি লক্ষ্য করতাম, নির্জনতার জন্য সেটি এক উৎকৃষ্ট স্থান।"

(হযরত মির্জা গোলাম আহমদ, আলাইহিস সালাম)

"আল্লাহ তা'আলার পবিত্র সত্তার প্রতি তাঁর সত্যনিষ্ঠ প্রেম সর্বদাই দৃশ্যমান ছিল। একবার আমি তাঁকে দোয়া করতে করতে কাঁদতে দেখেছি। গভীর বেদনায় তিনি তাঁর মওলা, তাঁর প্রিয়তমকে ডাকছিলেন এবং বারবার 'আমার প্রিয় আল্লাহ, আমার প্রিয় আল্লাহ'-এই শব্দগুলো তাঁর জিহ্বায় প্রবাহিত হচ্ছিল; তিনি ছিলেন রাসূল (সা.)-এর প্রেমিক, তিনি ছিলেন তাঁর উচ্চতম প্রভুর প্রেমিক। সেই প্রেমের নূর তাঁর মুখমণ্ডলে প্রতিফলিত ছিল। সেই নূরই তাঁর জিহ্বায় প্রবাহিত হতো। তাঁর জিহ্বা থেকেই সেই নূরের ঝরনাধারা প্রবাহিত হতো-কিন্তু চোখের অন্ধরা তা দেখতে পারেনি।"

(হযরত সাইয়্যিদা নবাব মুবারাকা বেগম সাহিবা রাদিয়াল্লাহু আনহা-এর বর্ণনা)

"আমি তো দেখি-যখন মানুষ দুনিয়া থেকে উদাসীন হয়ে যায়, যখন আমার বন্ধু ও শত্রু কেউই জানে না আমি কোন অবস্থায় আছি-তখন তুমি আমাকে জাগিয়ে তোলো এবং স্নেহ ও ভালোবাসার সাথে বলো, 'দুঃখ করো না, আমি তোমার সাথে আছি।' অতএব, হে আমার মওলা, এমন অনুগ্রহ থাকা সত্ত্বেও আমি কীভাবে তোমাকে ত্যাগ করতে পারি? কখনোই না। কখনোই না।" (হযরত মির্জা গোলাম আহমদ, আলাইহিস সালাম)

মসীহে মওউদ (আলাইহিস সালাম)-এর ঐশী প্রেম

নববর্ষ উপলক্ষে জামাআতের সদস্যদের দোয়ার প্রতি উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে।

দোয়া করুন-এই বছরটি আমাদের জন্য অসংখ্য বরকতের বছর হোক; আল্লাহ তা'আলা বিরোধী ও শত্রুদের সকল ষড়যন্ত্র ধূলিসাৎ করে দিন এবং জামাআতকে পূর্বের তুলনায় আরও অধিক উন্নতি ও সাফল্যে ভূষিত করুন।

এছাড়াও মসীহে মওউদ (আলাইহিস সালাম)-এর প্রপৌত্রী মুকাররমা রেহানা বাসমা সাহিবা (স্ত্রী: সাইয়্যিদ সৈয়দ আহমদ সাহিব নাসির), মুকাররমা ইফফাত হালিম সাহিবা (ন্যাশনাল প্রেসিডেন্ট, লাজনা ইমা'ইল্লাহ, লাইবেরিয়া) এবং মুকাররম আবদুল আলীম আল-বারবারি সাহিব (মিসর)-এর আলোচনা করা হয় এবং তাঁদের জন্য নামাযে জানাযা গায়েব আদায় করা হয়।

সৈয়্যদনা আমিরুল মো'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক লন্ডনের টিলফোর্ড স্থিত মসজিদে মুবারকে প্রদত্ত ২রা জানুয়ারী,, ২০২৬, এর জুমুআর খুতবা (২ সুলাহ ১৪০৫ হিজরী শামসী)

সৌজন্যে: আল-ফযল ইন্টারন্যাশনাল লন্ডন

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيمِ - بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ -

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ - الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ - مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ - اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ -

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ - صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۙ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ -

তাশাহ্হুদ, তা'উয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন,বিগত খুতবায় আল্লাহ্ তা'লার প্রতি ভালোবাসার প্রেক্ষাপটে মহানবী (সা.)-এর আদর্শ সম্পর্কে কিছু কথা বর্ণিত হয়েছিল। বর্তমান যুগে মহানবী (সা.)-এর সত্যনিষ্ঠ দাসের কর্মে এবং নিজ মনিবের অনুসরণ ও আনুগত্যের ক্ষেত্রে আমরা সেই ঐশী প্রেমের প্রতিফলন দেখতে পাই।

এই উদাহরণগুলো আজও বিদ্যমান। অর্থাৎ, আল্লাহ্ তা'লার ভালোবাসার যে উচ্চমান রয়েছে এবং এর ফলে তাঁর প্রতি আল্লাহ্ তা'লার যে অনুগ্রহরাজি বর্ষিত হয়েছে এবং আল্লাহ্ তা'লার প্রতি তাঁর যে ভালোবাসা ছিল, তা অন্যরাও অনুভব করত। তবে অন্যান্য ঘটনাবলি বর্ণনা করার পূর্বে আমি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর নিজের ভাষায় সেই ভালোবাসার উল্লেখ করছি। তিনি (আ.) এক স্থানে বলেন:

"আমার মোটেও জানা নেই, আমার কোন কর্মে র কারণে আমি খোদার এই অনুগ্রহ লাভ করেছি। আমি কেবল এটি অনুভব করি যে, প্রকৃতিগতভাবেই আমার হৃদয়ে মহান আল্লাহ্‌র প্রতি বিশ্বস্ততাপূর্ণ এক আকর্ষণ রয়েছে, যেটিকে কোনো কিছুই বাধা দিয়ে রাখতে পারে না। সুতরাং এটি কেবল তাঁরই অনুগ্রহ, যা মহান আল্লাহ্ আমার প্রতি করেছেন।"

(কিতাবুল বারিয়া, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড-১৩, পৃ: ১৯৫-১৯৬)

যেমনটি আমি বিগত খুতবায় উল্লেখ করেছিলাম, তিনি (আ.) বহু স্থানে এটিও ব্যক্ত করেছেন যে, আমি এই সবকিছু এ কারণেই লাভ করেছি যে, আমি আল্লাহ্ তা'লার প্রিয় নবী (সা.)-এর পূর্ণ অনুসারী এবং তাঁর একনিষ্ঠ প্রেমিক। আর এর ফলে আমার প্রতি আল্লাহ্ তা'লার ভালোবাসার দ্বারসমূহও উন্মুক্ত হতে থাকে এবং আমার মাঝে এর উপলব্ধি সৃষ্টি হয়। অতঃপর মহান আল্লাহ্‌র অনুগ্রহের বারিধারা আমার ওপর বর্ষিত হতে থাকে। তাঁর জীবনচরিত বর্ণনা করতে গিয়ে তাঁর হৃদয়ের এই অবস্থার কথা তুলে ধরে হযরত শেখ ইয়াকুব আলী ইরফানী সাহেব (রা.) এক স্থানে লেখেন: হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) লিখেছেন,

اَلْمَسَاجِدُ مَكَانِيْ وَالصَّالِحُوْنَ اِخْوَانِيْ وَذِكْرُ اللّٰهِ مَالِيْ وَخَلْقُ اللّٰهِ عِيَالِيْ۔ অর্থাৎ "মসজিদ হলো আমার আবাসস্থল, পুণ্যবানরা আমার ভাই, আল্লাহ্‌র যিকর আমার সম্পদ এবং তাঁর সৃষ্টি হলো আমার পরিবার।"

(হযরত শেখ ইয়াকুব আলি ইরফানি (রা.) রচিত হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর জীবন চরিত, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৪০২)

অর্থাৎ, তিনি যা বর্ণনা করেছেন তার সবকিছুই মহান আল্লাহ্‌কে কেন্দ্র করেই আবর্তিত হচ্ছে।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এক স্থানে বলেন:

"আমরা প্রতিটি বস্তু কে কেবলমাত্র আল্লাহ্‌র জন্যই ভালোবেসে থাকি। স্ত্রী হোক, সন্তান হোক কিংবা বন্ধুবান্ধব হোক- সবার সাথেই আমাদের সম্পর্ক কেবল আল্লাহ্‌র খাতিরে।"(মালফুযাত, ১ম খণ্ড, পৃ: ৪২৩)

এটিই সেই শিক্ষা যা মহান আল্লাহ্ দান করেছেন এবং মহানবী (সা.) এই শিক্ষাই প্রচার করতে বলেছেন। আর এই যুগে মহানবী (সা.)-এর আনুগত্যে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর কর্মের মাধ্যমেই এর সর্বোত্তম বহিঃপ্রকাশ ঘটে। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এক স্থানে বলেন:

"সত্যবাদীরা পরীক্ষার সময়েও অটল থাকেন এবং তারা জানেন, পরিশেষে আল্লাহ্ আমাদেরই সহায় হবেন। এই অধম যদিও এমন একনিষ্ঠ বন্ধু দের পেয়ে আল্লাহ্ তা'লার প্রতি কৃতজ্ঞ, কিন্তু তা সত্ত্বেও এই ঈমান রাখে যে, যদি একজন ব্যক্তিও সাথে না থাকে এবং সবাই আমাকে ফেলে রেখে যে যার মতো নিজের নিজের পথ ধরে, তবুও আমার কোনো ভয় নেই। আমি জানি, মহান আল্লাহ্ আমার সাথে আছেন। যদি আমাকে পিষে ফেলা হয়, পদপিষ্ট করা হয় এবং আমি একটি ধূলিকণার চেয়েও তুচ্ছ হয়ে যাই আর চতুর্দিক থেকে কষ্ট, গালি ও অভিসম্পাতের সম্মুখীন হই, তবুও পরিশেষে আমিই বিজয়ী হবো। আমাকে তিনি ছাড়া আর কেউ চেনে না যিনি আমার সাথে আছেন। আমি কখনোই ধ্বংস হতে পারি না। শত্রুদের চেষ্টা বৃথা এবং হিংসুকদের পরিকল্পনা নিষ্ফল।

হে নির্বোধ ও অন্ধরা! আমার পূর্বে কোন সত্যবাদী ধ্বংস হয়েছে যে, আমি ধ্বংস হয়ে যাব? কোন প্রকৃত বিশ্বস্ত ব্যক্তিকে আল্লাহ্ অপমানের সাথে ধ্বংস করেছেন যে, আমাকে ধ্বংস করবেন? নিশ্চিতভাবে মনে রেখো এবং কান খুলে শুনে নাও- আমার আত্মা ধ্বংস হওয়ার আত্মা নয় এবং আমার প্রকৃতিতে ব্যর্থতার কোনো উপকরণ নেই। আমাকে সেই সাহস ও নিষ্ঠা দান করা হয়েছে যার সামনে পাহাড়ও তুচ্ছ। আমি কারো পরোয়া করি না। আমি নিঃসঙ্গ ছিলাম এবং একাকী থাকায় অসন্তুষ্ট ছিলাম না। আল্লাহ্ কি আমাকে পরিত্যাগ করবেন? কখনোই নয়! তিনি কি আমাকে ধ্বংস করে দেবেন? কখনোই না! শত্রুরা লাঞ্ছিত হবে এবং হিংসুকরা লজ্জিত হবে, আর আল্লাহ্ তাঁর বান্দাকে প্রতিটি ময়দানে বিজয় দান করবেন। আমি তাঁর সাথে আছি এবং তিনি আমার সাথে আছেন; কোনো কিছুই আমাদের এই বন্ধন ছিন্ন করতে পারে না। আমি তাঁর সম্মান ও প্রতাপের শপথ করে বলছি, ইহজগত ও পরকালে আমার কাছে এর চেয়ে প্রিয় আর কিছু নেই যে, তাঁর ধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশিত হোক, তাঁর মহিমা উদ্ভাসিত হোক এবং তাঁরই জয়জয়কার হোক। তাঁর অনুগ্রহে আমি কোনো পরীক্ষায় ভীত নই; একটি কেন, কোটি পরীক্ষাতেও নই। পরীক্ষার ময়দানে এবং দুঃখকষ্টের অরণ্যে আমাকে শক্তি দান করা হয়েছে।"

ফাসী ভাষায় তিনি (আ.) একটি পঙ্‌ক্তিতে বলেন:

"আমি এমন নই যে, যুদ্ধের দিন তুমি আমার পিঠ দেখবে; বরং আমি সেই ব্যক্তি যার মস্ত ক তুমি ধূলি ও রক্তের মাঝে দেখতে পাবে।"তিনি (আ.) আমাদের বলেন, জামা' তকে সম্বোধন করে বলেন, আল্লাহ্‌রভালোবাসায় এটিই আমার অবস্থা। অতএব যদি কেউ আমার সাথে চলতে না পারে, সে যেন আমার থেকে পৃথক হয়ে যায়। দুঃখকষ্ট তো আসবেই। আমি জানি না, সামনে আরো কত ভয়ানক অরণ্য এবং কণ্টকাকীর্ণ উপত্যকা রয়েছে যা আমাকে অতিক্রম করতে হবে। অতঃপর তিনি বলেন:"আমরা কি ভূমিকম্প দেখে ভয় পেতে পারি? আমরা কি মহান আল্লাহ্‌র পথে পরীক্ষায় আতঙ্কিত হয়ে পড়ব? আমরা কি আমাদের প্রিয় খোদার কোনো পরীক্ষায় তাঁর সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করতে পারি? কখনোই পারি না!"(আনোয়ারুল ইসলাম, রূহানী খাযায়েন, ৯ম খণ্ড, পৃ: ২৩-২৪)

হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রা.) একটি রেওয়ায়েত বর্ণনা করেছেন, যেখানে মহান আল্লাহ্‌র প্র তি ভালোবাসা এবং তাঁর ধর্মে র খাতিরে কুরবানী করার ক্ষেত্রে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর উদ্দীপনার উল্লেখ এসেছে; হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রা.) বর্ণনা করেন যে, মৌলভী সারওয়ার শাহ সাহেব আমাকে এই ঘটনাটি বলেছেন; যে দিনগুলোতে গুরুদাসপুরে করম দীনের সাথে মামলা চলছিল এবং ম্যাজিস্ট্রেট (পরবর্তী) তারিখ নির্ধারণ করে দিয়েছিল, তখন হুযূর (আ.) কাদিয়ানে অবস্থান করছিলেন। হুযূর (আ.) মামলার তারিখের দুই দিন আগে আমাকে গুরুদাসপুরে পাঠিয়েছিলেন যেন আমি সেখানে গিয়ে কিছু উদ্ধৃতি খুঁজে প্রস্তুত রাখি; কারণ পরবর্তী শুনানিতে সেই উদ্ধৃতিগুলো পেশ করার কথা ছিল। হুযূর (আ.) আমার সাথে শেখ হামিদ আলী সাহেব এবং আব্দুর রহীম বাবুর্চিকেও গুরুদাসপুরে পাঠিয়েছিলেন। যখন আমরা গুরুদাসপুরের বাসায় পৌঁছলাম, তখন নীচ থেকে মরহুম ডাক্তার মুহাম্মদ ইসমাইল খান সাহেবকে ডাক দিলাম। তিনি সেখানে ছিলেন। আমরা তাঁকে নীচে এসে দরজা খুলতে বললাম। ডাক্তার সাহেব তখন সেই বাসার ওপর তলায় অবস্থান করছিলেন। আমাদের ডাক শুনে ডাক্তার সাহেব অত্যন্ত ব্যাকুল হয়ে কাঁদতে এবং চিৎকার করতে আরম্ভ করেন। আমরা বেশ কয়েকবার ডাকলাম, কিন্তু তিনি একইভাবে কাঁদতে থাকলেন। অবশেষে কিছুক্ষণ পর তিনি চোখ মুছতে মুছতে নীচে আসলেন। আমরা কান্নার কারণ জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, 'আমার কাছে মুনশি মুহাম্মদ হোসেন এসেছিল।' সেই ব্যক্তি আদালতে মু নশি হিসেবে কর্মরত ছিল এবং একজন অআহমদী ছিল। মৌলভীসাহেব বলেন, উক্ত মুহাম্মদ হোসেন গুরুদাসপুরের কোনো এক আদালতে মু হুরি বা পেশকারের কাজ করত এবং সে জামা'তের ঘোর বিরোধী ছিল। সে মৌলভী মুহাম্মদ হোসেন বাটালভীর সাথে মেলামেশা রাখত।

যাইহোক, ডাক্তার সাহেব নীচে এসে জানান, মু নশি মুহাম্মদ হোসেন এসেছিল এবং সে আমাকে বলেছে, 'সম্প্রতি এখানে আর্যদের জলসা হয়েছে। কিছু আর্য তাদের বন্ধুদেরও সেই জলসায় নিয়ে গিয়েছিল, সেই সূত্রে আমিও আমার এক আর্য বন্ধুর সাথে সেখানে গিয়েছিলাম। জলসার কার্যক্রম শেষ হবার পর কর্তৃপক্ষ ঘোষণা করে, জলসার কাজ শেষ হয়েছে, এখন সাধারণ মানুষ চলে যান, আমাদের একান্তে কিছু কথা আছে। ফলে বাইরের সব লোক উঠে যায়। আমিও চলে যাচ্ছিলাম, কিন্তু আমার আর্য বন্ধুটি বলল, আমরা একসাথেই যাব, আপনি একপাশে গিয়ে বসুন অথবা বাইরে অপেক্ষা করুন। তাই আমি সেখানে একপাশে গিয়ে বসে পড়লাম।' মুহাম্মদ হোসেন সাহেব, যিনি অআহমদী ছিলেন-তিনি এটি বলছেন।

তারপর আর্যদের মধ্য থেকে এক ব্যক্তি দঁ াড়িয়ে ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে মির্যা সাহেবের নাম নিয়ে বলে, 'এই ব্যক্তি আমাদের ঘোর শত্রু এবং আমাদের নেতা লেখরামের হত্যাকারী। এখন সে আপনার শিকার এবং পুরো জাতির দৃষ্টি আপনার দিকে। আপনি যদি এই শিকারকে হাতছাড়া হতে দেন, তবে আপনি জাতির শত্রু হিসেবে গণ্য হবেন।' সেই ব্যক্তি এ ধরনের উত্তেজনামূলক কথা বলে। এতে ম্যাজিস্ট্রে ট উত্তর দেয়, 'আমার তো আগে থেকেই ইচ্ছা রয়েছে যে, শুধু মির্যাকেই নয় বরং সম্ভব হলে এই মামলায় তার যত সঙ্গী ও সাক্ষী আছে-সবাইকে জাহান্নামে পৌঁছে দিই। কিন্তু কী আর করা যাবে! মামলাটি এমন বিচক্ষণতার সাথে পরিচালনা করা হচ্ছে যে, হাত দেবার মতো কোনো সুযোগ পাওয়া যাচ্ছে না। তবে এখন আমি প্রতিজ্ঞা করছি, যা-ই হোক না কেন, এই প্রথম শুনানিতেই আমি আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করব।'

মৌলভী সাহেব বলতেন, ডাক্তার সাহেব বর্ণনা করছিলেন যে, মুহাম্মদ হোসেন তাঁকে বলছিল, 'আপনি হয়ত বুঝতে পারেন নি যে, আইনি ব্যবস্থা বলতে কী বোঝানো হয়েছে। এর অর্থ হলো, প্রত্যেক ম্যাজিস্ট্রেটের মামলার শুরুতে বা মামলা চলাকালে যেকোন সময় আসামিকে জামিন না দিয়ে গ্রেপ্তার করে হাজতে পাঠিয়ে দেবার ক্ষমতা থাকে।' মুহাম্মদ হোসেন আরো বলে, 'ডাক্তার সাহেব, আপনি জানেন যে, আমি আপনাদের জামা'তের ঘোর বিরোধী।' [সে মৌলভী মুহাম্মদ হোসেন (বাটালভী)-এর অনুসারী ছিল, বিরোধী ছিল এবং নামও একই ছিল।] 'কিন্তু আমার বৈশিষ্ট হলো, আমি কোনো সম্মানিত পরিবারকে লাঞ্ছিত ও ধ্বংস হতে দেখতে পারি না, বিশেষ করে হিন্দুদের হাতে লাঞ্ছিত হতে দেখতে চাই না। আর আমি জানি, মির্যা সাহেবের পরিবার এই জেলায় সবচেয়ে বেশি সম্মানিত। তাই আমি আপনাকে এই খবরটি পৌঁছে দিলাম যেন আপনারা এর কোনো ব্যবস্থা নিতে পারেন।' সে এরপর তার নিজের মতামতও ব্যক্ত করেছিল। সে বলে, আমার মতে দুটি উপায় আছে; একটি হলো, এখান থেকে মামলাটি চিফ কোর্টে স্থানান্তরের চেষ্টা করা। (সেই যুগে হাই কোর্টকে চিফ কোর্ট বলা হতো।) আর দ্বিতীয়টি হলো, যেমন করেই হোক, মির্যা সাহেব যেন আগামী শুনানিতে আদালতে উপস্থিত না হন এবং একটি ডাক্তারি সার্টিফিকেট পেশ করে দেন।'

মৌলভী সাহেব বর্ণনা করেন, ডাক্তার সাহেব যখন এই ঘটনা শোনান, তখন আমরা সবাই অত্যন্ত ভীত হয়ে পড়ি এবং সিদ্ধান্ত নিই, এখনই কোনো ব্যক্তিকে

কাদিয়ানে পাঠিয়ে দেওয়া উচিত যে হুযূর (আ.)-কে এই সমস্ত ঘটনা বিস্তারিত জানাবে। রাত হয়ে গিয়েছিল, আমরা এক্কা গাড়ি বা ঘোড়ার গাড়ি খুঁজলাম, অর্থাৎ বাহন সন্ধান করলাম। যদিও বেশ কিছু এক্কা সেখানে ছিল, কিন্তু বিরোধিতা এত তুঙ্গে ছিল যে, কোনো এক্কা পাওয়া যাচ্ছিল না,কোনো বাহন পাওয়া যাচ্ছিল না। কেউই যেতে রাজি হচ্ছিল না, সবাই অস্বীকার করছিল। আমরা চারগুণ ভাড়া দেবার কথা বললাম, কিন্তু কোনো এক্কাওয়ালা রাজি হয় নি। অবশেষে আমরা শেখ হামেদ আলী ও বাবুর্চি আব্দুর রহীম এবং তৃতীয় আরেকজনকে পদব্রজে কাদিয়ান প্রেরণ করি। তারা ফজরের নামাযের সময় কাদিয়ান পৌঁছেন এবং হযরত সাহেবের কাছে সংক্ষেপে (পুরো ঘটনা) খুলে বলেন। হুযূর (আ.) ভ্রুক্ষেপহীন অবস্থায় বলেন, ঠিক আছে, আমরা বাটালায় যাই। খাজা সাহেব এবং মৌলভী মুহাম্মদ আলী সাহেব লাহোর থেকে ফেরত আসার সময় আমাদের সঙ্গে সেখানেই দেখা করবেন। [হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) তাদেরকে বলেন, লাহোর থেকে খাজা সাহেব এবং মৌলভী মুহাম্মদ আলী সাহেব আসছেন, সেখানেই সাক্ষাৎ হবে।] আমরা সেখানে তাদের কাছে এসব কথা বলব, যা (তিনি) বলছিলেন। আর সেখানে জানা যাবে, মামলা স্থানান্তরের প্রচেষ্টার ফলাফল কী হয়েছে। ম্যাজিস্ট্রেটের পক্ষপাতিত্বের বিষয়টি আঁচ করতে পেরে আমাদের আইনজীবীরা আগেই মামলাটি অন্য কোনো আদালতে অর্থাৎ চিফ কোর্টে স্থানান্তরের আবেদন করে রেখেছিলেন।

তদনুসারে সেই দিনই হুযূর (আ.) বাটালায় চলে আসেন। গাড়িতে মৌলভী মুহাম্মদ আলী সাহেব এবং খাজা সাহেবের সাথেও দেখা হয়ে যায়। তারা জানান, মামলা স্থানান্তরের প্রচেষ্টা সফল হয় নি। [চিফ কোর্টে মামলাটি স্থানান্তরের যে আবেদন করা হয়েছিল সেটি গৃহীত হয় নি।] এরপর হযরত সাহেব গুরুদাসপুরে চলে আসেন আর পথিমধ্যে খাজা সাহেব

এবং মৌলভী সাহেবকে এই বিষয়ে (অর্থাৎ ম্যাজিস্ট্রেটের শত্রুতার বিষয়ে) কিছুই বলেন নি। [কী সংবাদ এসেছে- এ সম্পর্কে তিনি কোনো কথাই বলেন নি।] যখন তিনি (আ.) গুরুদাসপুরে সেই বাসায় পৌঁছেন যেখানে থাকার ব্যবস্থা ছিল, তখন নিজের অভ্যাস অনুযায়ী হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) পৃথক কক্ষে গিয়ে খাটিয়ার ওপরে শুয়ে পড়েন। মৌলভী সাহেব বলেন, ঐ সময় (ম্যাজিস্ট্রেটের ষড়যন্ত্রে র কথা ভেবে) আমাদের শরীরের লোম কাঁটা দিয়ে ওঠে যে, এখন কী হবে? [কারণ ম্যাজিস্ট্রেট দৃঢ়প্র তিজ্ঞ।] হুযূর (আ.) কিছু ক্ষণ পর মৌলভী সাহেবকে ডেকে পাঠান। তিনি বলেন, আমি গিয়ে দেখি, হযরত সাহেব উভয় হাতের তালু একত্র করে তাঁর মাথার নীচে দিয়ে রেখেছেন এবং চিত হয়ে শুয়ে আছেন। [সোজা হয়ে শুয়ে ছিলেন।] আমি যাবার পর তিনি (আ.) একদিকে কাত হয়ে কনুইয়ের ওপর ভর দিয়ে নিজের হাতের তালুতে মাথা রেখে শুয়ে পড়েন এবং আমাকে বলেন, আমি সেই পুরো ঘটনাটি শোনার জন্য আপনাকে ডেকেছি যে, বিষয়টি আসলে কী? সে-সময় কক্ষে আর কেউ ছিল না, দরজার পাশে শুধুমাত্র মিয়া শাদী খান দাঁড়িয়ে ছিলেন। আমি সম্পূর্ণ ঘটনা শুনালাম যে, কীভাবে আমরা এখানে এসে ডাক্তার ইসমাঈল খান সাহেবকে ক্রন্দনরত অবস্থায় পেলাম,ডাক্তার সাহেব মুনশি মুহাম্মদ হোসেনের আগমনের কথা বলেন আর অতঃপর মুহাম্মদ হোসেন কী ঘটনা বলেছিল- তা-ও বললাম। হুযূর (আ.) নীরবে শুনছিলেন। যখন আমি 'শিকার' শব্দে পৌঁছি- [অর্থাৎ সে যে বলেছিল, মির্যা সাহেব এখন আপনার শিকার-] তখন হঠাৎ হযরত সাহেব উঠে বসেন, তাঁর চোখ দুটো জ্বলে ওঠে এবং মুখমণ্ডল রক্তিম হয়ে যায়

আর তিনি (আ.) বলেন, 'আমি তার শিকার? আমি শিকার নই; আমি সিংহ, তা-ও আবার খোদার সিংহ! সে খোদার সিংহের ওপর হাত দেবার দুঃসাহস করতে পারে কি? এমনটি করে তো দেখুক!'

এই বাক্য বলার সময় তাঁর কণ্ঠস্বর এত উঁচু ছিল যে, কক্ষের বাইরের লোকজনও চমকে ওঠে এবং বিস্ময়ের সঙ্গে (এদিকে) মনোযোগ নিবদ্ধ করে, কিন্তু কেউই কক্ষের ভেতরে আসে নি। হুযূর (আ.) কয়েকবার 'খোদার সিংহ' শব্দটি পুনরাবৃত্তি করেন। আর সেসময় তাঁর চোখ দুটি যা সবসময় অবনত ও অর্ধ-নিমীলিত থাকত- সত্যিকার অর্থেই সিংহের চোখের ন্যায় প্রজ্জ্বলিত হয়ে উঠেছিল এবং চেহারা এতটাই রক্তিম ছিল যে, (সেদিকে) তাকানো যাচ্ছিল না।

এরপর তিনি (আ.) বলেন, "আমি কী করব? আমি তো আল্লাহ্‌র সমীপে (বিষয়টি) উপস্থাপন করেছি যে, আমি তোমার ধর্মের খাতিরে লোহার হাতকড়া ও বেড়ি পরতেও প্রস্তুত আছি। [অর্থাৎ আমাকে হাতকড়া পরালেও আমার কিছু যায় আসে না, শিকল পরতেও প্রস্তুত আছি, কিছুই হবে না; বরং এতে আমার কিছুই যায় আসে না।] কিন্তু তিনি বলেছেন, অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন, 'না! আমি তোমাকে লাঞ্ছিত হওয়ার হাত থেকে রক্ষা করব এবং সসম্মানে মুক্তি দেবো'।"

অতঃপর তিনি (আ.) ঐশীপ্রেম সম্পর্কে বক্তৃতা দিতে আরম্ভ করেন এবং প্রায় আধা ঘণ্টা পর্য ন্ত আল্লাহ্‌র ভালোবাসায় পরম আবেগের সাথে বলতে থাকেন।

(সূত্র: সীরাতুল মাহদী, ১ম খণ্ড, রেওয়ায়েত নম্বর-১০৭)

আল্লাহ্ তা'লার সাথে প্রেম-ভালোবাসায় আত্মত্যাগের এক বিস্ময়কার দৃষ্টান্ত। আল্লাহ্ তা'লার সত্তার প্রতি তাঁর কত অগাধ আস্থা ছিল! আর এই আস্থা ছিল মূলত খোদাপ্রেমেরই প্রতিফলন। আর তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, যেহেতু আমি আল্লাহ্ তা'লাকে ভালোবাসি এবং তাঁর খাতিরে যে-কোনো কুরবানীর জন্য প্রস্তুত আছি, তাই আল্লাহ্ তা'লা আমাকে কখনো ধ্বংস করবেন না।

অনুরূপ আরেকটি ঘটনা রয়েছে। একবার পুলিশ সুপারিনটেনডেন্ট ক্যাপ্টেন লেমারচান্দ (Captain Lemarchand) লেখরাম হত্যার সন্দেহে বিশাল পুলিশ বাহিনী নিয়ে হঠাৎ কাদিয়ানে উপস্থিত হয় এবং হযরত মীর নাসের নওয়াব সাহেব (রা.) এই সংবাদ পান। তখন তিনি অত্যন্ত বিচলিত হয়ে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর কাছে যান। তিনি অত্যন্ত ভারাক্রান্ত কণ্ঠে কোনোমতে নিবেদন করেন, (পুলিশ) সুপারিনটেনডেন্ট গ্রেপ্তারি পরোয়ানা ও হাতকড়া নিয়ে আসছে। হযরত আকদাস (আ.) তখন তাঁর পুস্তক 'নূরুল কুরআন' রচনা করছিলেন। তিনি প্রশান্তচিত্তে মাথা তুলে হাসিমুখে বলেন,

'মীর সাহেব! মানুষ তো আনন্দের সময় সোনা-রূপার কঙ্কণ বা চুড়ি পরে থাকে; আমরা না হয় মনে করব, আমরা আল্লাহ্ তা'লার পথে লোহার কঙ্কণ পরেছি।'এরপর কিছুক্ষণ নীরব থেকে তিনি বলেন, 'তবে এমনটি হবে না, কারণ ঐশী রাজত্বের নিজস্ব নিয়মনীতি আছে; তিনি তাঁর খলীফা ও প্রেরিতদের এভাবে লাঞ্ছিত করেন না।' বাস্তবে তা-ই হয়েছিল এবং তারা (তথা পুলিশ) সফল হতে পারে নি।(আল হাকাম, খণ্ড-৩৯, ৭ই জুন, ১৯৩৬)

একইভাবে মৌলভী আব্দুল করীম শিয়ালকোটি সাহেব (রা.) একটি ঘটনা লিপিবদ্ধ করেছেন।

তিনি বলেন, "একবার হুযূর (আ.) জলন্ধরে অবস্থানকালে বলেছিলেন, পরীক্ষার সময় জামা'তের কিছু দুর্বলচিত্ত লোকদের নিয়ে আমার আশঙ্কা হয়। [জামা'তের দুর্বল হৃদয়ের মানুষদের ব্যাপারে চিন্তা হয়। অর্থাৎ পরীক্ষা তো আসেই, মামলা-মোকদ্দমা হয় এবং বিরোধিতাও হতো, তাঁরও হয়েছে এবং তাঁর জামা'তের সদস্যদেরও হয়েছে। এমতাবস্থায় তিনি (আ.) বলেছেন, আমাদের চিন্তা হয় কেবল জামা'তের সেসব দুর্বলচিত্তের মানুষদের নিয়ে, কোনো কোনো দুর্বল ঈমানের লোকদের জন্য হয়ে থাকে।]

এরপর তিনি (আ.) বলেন, "আমার অবস্থা তো এমন যে, আমি যদি পরিষ্কারভাবে এই শব্দও শুনতে পাই যে, 'তুই প্রত্যাখ্যাত এবং তোর কোনো মনোবাসনা আমরা পূর্ণ করব না'- তবে আল্লাহ্ র কসম! এই ঐশীপ্রেম, ভালোবাসা এবং ধর্মসেবায় আমার বিন্দুমাত্র কমতি হবে না। তখনও আমি আল্লাহ্‌কে পরিত্যাগ করব না, ভালোবাসাও কমবে না। কারণ আমি তো তাঁকে প্রত্যক্ষ করেছি।"

(সীরাত মসীহ মওউদ (আ.), প্রণেতা - হযরত মৌলানা আব্দুল করীম সাহেব সিয়ালকুটি, পৃ: ৫৩)

আল্লাহ্ তা'লার প্রতি আমার আস্থা ও দৃঢ় বিশ্বাস রয়েছে। যা-ই হোক না কেন-আমার ভালোবাসা বা আন্তরিকতায় কোনো ঘাটতি দেখা দেবে না।

অনুরূপভাবে হযরত নওয়াব মুবারকা বেগম সাহেবা (রা.) একটি ঘটনা বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, "মসীহ্ মওউদ (আ.) তাঁর পরম প্রিয় সত্তা আল্লাহ্‌র প্রতি যে প্রেম লালন করতেন,যা তাঁর আত্মা ও দেহের রন্ধ্রে রন্ধ্রে মিশে ছিল, তা তাঁর প্রতিটি কথা ও কাজে সবসময় স্পষ্টভাবে ফুটে উঠত। আমি নামাযের সময় ছাড়াও তাঁকে (আ.) নিজের পরম দয়ালু প্রভুকে অত্যন্ত আকুল হয়ে ডাকতে শুনেছি।"

[শুধু নামাযের সময়েই নয়, বরং সাধারণ অবস্থায়ও অত্যন্ত ব্যাকুল হয়ে আল্লাহ্‌কে ডাকতে শুনেছি।] আর তিনি (আ.) কী বলতেন? 'হে আমার প্রিয় আল্লাহ্! হে আমার প্রিয় আল্লাহ্, হে আমার প্রিয় আল্লাহ্'। এমন (দরদভরা) কণ্ঠে ডাকতেন যে, [তিনি বলেন,] মনে হয় সেই আওয়াজ আমি এখনো শুনছি, আমার কানে প্রতিধ্বনিত হচ্ছে আর আমি যেন তাঁর অশ্রুধারা প্রত্যক্ষ করেছি। [সেই দৃশ্যটি এখনও আমার চোখের সামনে ভাসছে। তিনি সেই সময়ের একটি চিত্র অংকন করেছিলেন।] তাঁর সেই চিরন্তন ও প্রিয় আল্লাহ্‌র জন্য আত্মাভিমানের একটি চোখে দেখা দৃষ্টান্ত বর্ণ না করে তিনি (রা.) বলেন, 'এটি তো ছিল দোয়ার অবস্থা, যা আমি দেখেছিলাম। তবে আরেকটি ঘটনাও উল্লেখ করছি। তিনি (আ.) নিজের কক্ষে ছিলেন এবং বাইরে যাবার জন্য প্রস্তুত ছিলেন, কোথাও যাচ্ছিলেন। আমি তাঁর কাছেই ছিলাম। (এমন সময়) আমাদের জে ঠি সাহেবার ব্যক্তিগত সেবিকা, যিনি জেঠি সাহেবার প্রায় কাছাকাছি সময়েই বয়আত

মহানবী (সা.)-এর বাণী

যখন তোমাদের কাছে কোনও ধর্মপরায়ণ ও নীতিবান ব্যক্তি বিবাহ প্রস্তাব পাঠায়, তখন সেই প্রস্তাব গ্রহণ করে নিও; অন্যথায় পৃথিবীতে অশান্তি ও অরাজকতা তৈরী হবে। (তিরমিযি, কিতাবুন নিকাহ)

দোয়াপ্রার্থী: Qazi Abdur Rasheed, Basantapur, 24 PGS (s)

যুগ খলীফার বাণী

"জাতি সত্তা অর্জনের জন্য ঐক্য ও আনুগত্য অত্যন্ত জরুরী।" **(খুতবা জুমআ, প্রদত্ত- ৫ ডিসেম্বর, ২০১৪)**

দোয়াপ্রার্থী: Sk. Zakir Hossain Sb, Bankura (W.B)

করেছিলেন এবং বেহেশতী মাকবেরায় সমাহিত আছেন, (তিনি) হযরত আম্মাজানের কাছে আসেন। আত্মীয়তার খাতিরে তিনি তার কাছে আমাদের চাচা মির্যা ইমাম উদ্দীনের মৃত্যুতে সমবেদনা প্রকাশ করেন। সে যখন পাঞ্জাবীতে এই কথাটি বলছিল যে, 'সে কত ভালো মানুষ ছিল!' হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বাইরে বের হন। তাঁর পবিত্র চেহারা রক্তিম হয়ে উঠে। তিনি তাঁর লাঠি মাটিতে আঘাত করে বলেন,

"হতভাগী! তুই আমার ঘরে বসে আমার খোদার শত্রুর প্র শংসা করছিস? মির্যা ইমাম উদ্দীন সাহেব ইসলামবিমুখ ছিল এবং আল্লাহ্ তা'লাকে নিয়ে উপহাস করত।" তাঁর (আ.) আত্মাভিমান এটা সহ্য করতে পারে নি যে, তাঁর ঘরে বসে এমন একজনের আলোচনা করা হবে। নওয়াব মুবারকা বেগম সাহেবা (রা.) লেখেন, তাঁর কণ্ঠে এমন প্রতাপ ছিল যে, সেই মহিলা সেখান থেকে দৌড়ে পালিয়ে যায়।

মির্যা ইমাম উদ্দীন সাহেব ছিল নাস্তিক, আর তাঁর (আ.) ঘরে এমন একজন নাস্তিকের এত প্রশংসা করা তার জন্য সহ্য করা ছিল অসম্ভব।

(তাহরীরাত মুবারিকা, পৃ: ২২৩-২২৪)

তিনি (রা.) শৈশব ও যৌবনকাল থেকেই তাঁর মনিব হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর অনুসরণে আল্লাহ্ তা'লার ভালোবাসায় সময় অতিবাহিত করেছেন।

একটি রেওয়ায়েতে হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রা.) লেখেন,

" একজন শিখ জমিদারের বিবৃতি, যিনি আমাদের দাদার পক্ষ থেকে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর জন্য চাকরির প্রস্তাব নিয়ে এসেছিলেন। একবার একজন উর্ধ্বতন কর্মকর্তা বা প্রভাবশালী ব্যক্তি আমাদের দাদাকে জিজ্ঞেস করেন, "শুনেছি আপনার একটি ছোটো ছেলেও আছে, কিন্তু তাকে আমরা কখনো দেখি নি।" দাদাজান [হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর পিতা] মুচকি হেসে বলেন, "হ্যাঁ, আমার একটি ছোটো ছেলে আছে বটে, কিন্তু নববধূর মতো তাকে খুব কমই দেখা যায়। যদি তাকে দেখতে চাও, তবে মসজিদের কোনো কোণে গিয়ে দেখো। সে তো মুসীতাড় (অর্থাৎ মসজিদেই পড়ে থাকে)।"

(সীরাতে তৈয়্যবা, প্রণেতা-হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব এম.এ, পৃ: ৯-১০)

এই রেওয়ায়েতটি মিরাজ দ্বীন উমর সাহেব আরো বিশদভাবে লিখেছেন। তিনি (হুযূরের পিতা) বলেন, মসজিদের অযুখানার কলের কাছে গিয়ে খোঁজো। সেখানে না পেলে হতাশ হয়ে ফিরে এসো না। মসজিদের ভেতরে চলে যেও এবং সেখানে কোনো এক কোণে খুঁজে দেখো। সেখানেও না পেলে নিরাশ হয়ে ফিরে যেও না। কোনো নামাযের চাটাইয়ে দেখো, হয়ত কেউ তাকে চাটাই দিয়ে পেঁচিয়ে একপাশে দাঁড় করিয়ে রেখে গেছে। কারণ সে তো জীবিত থেকেও মৃত। তাঁর ফানাফিল্লাহ্ (আল্লাহ্তে বিলীন) অবস্থা এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে যে, কেউ যদি তাঁকে চাটাই দিয়ে পেঁচিয়েও ফেলে, তবুও সে প্রতিবাদ করবে না,"

(হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর সংক্ষিপ্ত জীবনি, প্রণেতা- মেরাজুদ্দীন উমর, পৃ: ৬৭)

টেরও পাবে না।

একইভাবে হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রা.) আরো একটি রেওয়ায়েত বর্ণনা করেছেন। তিনি লেখেন, আমার কাছে হাজী আব্দুল মজীদ সাহেব লুধিয়ানভী বর্ণনা করেছেন, একবার হুযূর (আ.) লুধিয়ানায় অবস্থান করছিলেন। আমার বাড়িতে একটি নিমগাছ ছিল। যেহেতু বর্ষাকাল ছিল, তাই গাছের পাতাগুলো অত্যন্ত সতেজ ও সবুজ লাগছিল। হুযূর (আ.) আমাকে বলেন, 'হাজী সাহেব, এই গাছের পাতাগুলোর প্রতি লক্ষ করুন! কত সুন্দর লাগছে।' হাজী সাহেব বলেন, সেই সময়ে আমি লক্ষ করি যে, তাঁর চোখ অশ্রুতে পরিপূর্ণ ছিল।" (সীরাতুল মাহদী, ১ম খণ্ড, পৃ: ৯৫)

আল্লাহ্ তা'লার মহিমা এবং তাঁর ভালোবাসা তাঁর মনে জেগে উঠেছিল, আর সে কারণেই ঐ সময় তাঁর চোখ অশ্রুসজল হয়েছিল।

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, "এখানে এক ব্যক্তি ছিলেন, যিনি পরে খুবই নিষ্ঠাবান আহমদী হয়েছিলে এবং হযরত সাহেবের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। কিন্তু আহমদী হবার পূর্বে হযরত সাহেব তাঁর প্রতি বিশ বছর অসন্তুষ্ট ছিলেন। এর কারণ ছিল, হযরত সাহেব তার একটি কথায় চরম অসন্তুষ্ট হয়েছিলেন। বিষয়টি এমন ছিল যে, তার এক ছেলে মারা গিয়েছিল। হযরত সাহেব নিজ ভাইয়ের সাথে তাদের কাছে শোক প্রকাশ করতে গেলেন, সমবেদনা জানাতে গেলেন। তাদের রীতি ছিল, ঘনিষ্ঠ কোনো বন্ধু আসলে তাকে আলিঙ্গান করে কান্না করত এবং চিৎকার করত। সে অনুযায়ী তিনি হযরত সাহেবের বড়ো ভাইকে জড়িয়ে ধরে কাঁদতে কাঁদতে বলেন, আল্লাহ্ আমার প্রতি ভীষণ অন্যায় করেছেন! এটি শুনে হযরত সাহেবের এত বিতৃষ্ণা হলো যে, তিনি তার চেহারাও দেখা পছন্দ করতেন না। পরবর্তী তে আল্লাহ্ তা'লা সেই ব্যক্তিকে সুযোগ দেন এবং তিনি এসব অজ্ঞতাপূর্ণ কাজ থেকে বিরত হন।"

(তকদীরে ইলাহি, আনোয়ারুল উলুম, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ৬০৬-৬০৭)

একইভাবে হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রা.) আরেকটি রেওয়ায়েত করেন, "কপুরথলা নিবাসী মুনশি জাফর আহমদ লিখিতভাবে আমার নিকট বর্ণনা করেছেন, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর মাথাঘোরা রোগ ছিল। একজন চিকিৎসক সম্পর্কে জানা যায়, তিনি এই বিষয়ে বিশেষ দক্ষতা রাখেন, এই রোগের চিকিৎসা করেন। তাকে যাতায়াত ভাড়া দিয়ে দূর থেকে ডেকে আনা হয়। তিনি হুযূরকে (আ.) দেখে বলেন, দুইদিনে আমি আপনার স্বাস্থ্য বহাল করে দেবো, আমি আপনাকে ঠিক করে দেবো। এটি শুনে হযরত সাহেব বাড়ির ভেতরে চলে গেলেন এবং হযরত মৌলভী নূরুদ্দীন সাহেবকে চিরকুট পাঠালেন, আমি কোনোভাবেই এই ব্যক্তির কাছ থেকে চিকিৎসা করাতে চাই না। সে কি ঈশ্বরত্বের দাবি করে? তাকে ফেরত যাত্রার ভাড়া এবং অতিরিক্ত পঁচিশ টাকা দিয়ে পাঠিয়ে দিন। অর্থাৎ নিজের কাছ থেকে পাঠিয়ে বলেন, এটি তাকে দিয়ে দিন এবং তাকে বিদায় করে দিন। এমনটাই করা হলো। তিনি বলেন, সে বলছে- আমি ঠিক করে দেবো! আল্লাহ্ তা'লা ব্যতীত আর কে ঠিক করতে পারে? আসল আরোগ্যদাতা হলেন আল্লাহ্ তা'লা। (সীরাতুল মাহদী, ২য় খণ্ড, রেওয়ায়েত নম্বর-১০৩৮)

একইভাবে হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রা.) কপুরথলা নিবাসী মুনশি জাফর আহমদ সাহেবের বরাতে আরেকটি রেওয়ায়েত বর্ণনা করেন।

" মরহুম চৌধুরী রুস্তম আলী সাহেব রেলওয়ের ইন্সপেক্টর ছিলেন। মাসিক একশ পঞ্চাশ টাকা পেতেন। খুবই নিষ্ঠাবান ও জামা'তের মাঝে উল্লেখযোগ্য ব্যক্তি ছিলেন। তিনি মাসিক বিশ টাকা নিজের কাছে রেখে বেতনের পুরো টাকা হযরত সাহেবকে পাঠিয়ে দিতেন। এটি তাঁর স্থায়ী রীতি ছিল। তার শুধু একজন পুত্র ছিল। সে অসুস্থ হলে সস্ত্রীক তাকে নিয়ে কাদিয়ান চলে আসেন। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর গৃহে অবস্থান করেন। হযরত আকদাস একদিন বলেন, আমি রাতে স্বপ্নে দেখলাম, আমার আল্লাহ্কে কেউ গালি দিচ্ছে। আমি এতে ভীষণ ব্যথিত হই। যেদিন তিনি (আ.) এই স্বপ্নের উল্লেখ করেন, এর পরদিন চৌধুরী সাহেবের পুত্র মারা যায়। যেহেতু একমাত্র পুত্রসন্তান ছিল, তার মা অনেক আহাজারি করে এবং এই অবস্থায় তার মুখ থেকে বেরিয়ে পড়ে, 'হে যালিম! তুমি আমার প্রতি অনেক অন্যায় করেছ।' আল্লাহ্কে সম্বোধন করে তিনি এ কথা বলেন। এমন শব্দ কয়েকবার তিনি বলেন যা হযরত সাহেব শুনতে পান। সে সময় তিনি (আ.) বাহিরে আসেন। তাঁকে খুবই ব্যথিত মনে হচ্ছিল । অত্যন্ত উত্তেজিত অবস্থায় তিনি বলেন, এই মুহূর্তে এই মহিলা আমার ঘর থেকে বেরিয়ে যাক! ডাক্তার মীর মুহাম্মদ ইসমাঈল সাহেবের মা খুবই বুদ্ধিমতী ও বিচক্ষণ ছিলেন। তিনি চৌধুরী সাহেবের স্ত্রীকে বুঝালেন এবং বললেন, হযরত সাহেব ভীষণ রাগান্বিত। সেই মহিলা তওবা করেন, ক্ষমা প্রার্থনা করেন এবং বলেন, এখন থেকে আমি কান্নাকাটিও বন্ধ করলাম। মীর সাহেবের মা হযরত সাহেবের কাছে এসে উল্লেখ করে বলেন, এখন ক্ষমা করে দিন। সে তওবা করছে এবং কান্নাকাটি বন্ধ করেছে। হযরত সাহেব বলেন, ঠিক আছে, তাকে থাকতে দাও এবং ছেলেটার দাফন-কাফনের ব্যবস্থা করো।"

(সীরাতুল মাহদী, ২য় খণ্ড, রেওয়ায়েত নম্বর-১১১৯)

শেখ ইয়াকুব আলী ইরফানী (রা.) হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর জীবনী সম্পর্কে লিখতে গিয়ে বর্ণনা করেন, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) স্বয়ং বর্ণনা করেছেন, তাঁর ভাষাতেই ইরফানী সাহেব লিখেছেন,

যখনই মাঝে মাঝে ডালহৌসি যাওয়ার সুযোগ হয়েছে, পাহাড়ের সবুজ-শ্যামল প্রান্তর এবং প্রবাহমান পানি দেখে হৃদয়ে অবলীলায় আল্লাহ্ তা'লার গুণকীর্তনের স্পৃহা সৃষ্টি হতো, ইবাদতে এক স্বাদ আসত। আমার অভিজ্ঞতা হলো, নির্জন সময় কাটানোর সেখানে উত্তম সুযোগ পাওয়া যায়।"

(হায়াতে আহমদ, ১ম খণ্ড, পৃ: ৮৫)

অনুরূপভাবে সেই স্বাদ ও প্রেম-ভালোবাসার উল্লেখ করতে গিয়ে এক স্থানে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেছেন,

আল্লাহ্ তা'লাকে যারা ভালোবাসে তাদের হৃদয়ে এমন ভালোবাসা সৃষ্টি হয়, তাদেরকে যদি হামান-দিস্তায় ফেলে পিষা হয়, বা পিষে ফেলার যন্ত্র অথবা গ্রাইন্ডার মেশিনে রেখে পিষে দেওয়া হয় অথবা কোনো ভাঙন যন্ত্রে ফেলে তার রস নিঙড়ানো হয়, তাতে ঐশী ভালোবাসা ছাড়া অন্য কিছু দৃষ্টিগোচর হবে না।

অন্য আরেকটি বর্ণনায় মালেক মওলা বখশ সাহেবের বরাতে হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রা.) বর্ণনা করেন, "মরহুম সাহেবযাদা মির্যা মুবারক আহমদ সাহেব যখন অসুস্থ ছিলেন তাকে নিয়ে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর দুঃশ্চিন্তা ও উদ্বেগের কথা কানে আসত। যখন সাহেবযাদা সাহেব মৃত্যুবরণ করেন তখন সরদার ফযল হক সাহেব এবং ডাক্তার ইবাদুল্লাহ্ সাহেব মরহুম এবং এই অধম

মহান আল্লাহ্র বাণী

তোমরাই শ্রেষ্ঠ উম্মত, যাহাকে মানবজাতির (কল্যাণের) জন্য উত্থিত করা হইয়াছে। তোমরা ন্যায় সঙ্গত কাজের আদেশ দিয়া থাক এবংঅসঙ্গত কাজ হইতে বারণ করিয়া থাক এবং আল্লাহতে ঈমান রাখ। (আলে ইমরান:১১১)

দোয়াপ্রার্থী: Late Sawkat Ahmad Molla & Jahanara Bibi
From-Sabina Parveen. Banshra, 24 PGS (S)

যুগ ইমামের বাণী

কেবল মৌখিক বয়াতের অঙ্গীকারের কোনই মূল্য নাই, যে পর্যন্ত দৃঢ়-চিত্ততার সহিত উহার উপর আমল করা না হয়।

(কিশতিয়ে নূহ, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড-১৯)

দোয়াপ্রার্থী: Late Hasan Laskar
From-Kutubuddin Laskar Sb. Banshra, 24 PGS (S)

সমবেদনা জ্ঞাপন করার জন্য কাদিয়ানে আসেন। কিন্তু যখন হুযূর (আ.) মসজিদে আগমন করলেন তখন হুযূর (আ.)-কে পূর্বের ন্যায়, বরং তার চেয়ে অধিক আনন্দিত দৃষ্টিগোচর হচ্ছিল।

সাহেবযাদা মরহুমের মৃত্যুর বিষয়ে যখন উল্লেখ করা হলো তখন হুযূর (আ.) বললেন, "মুবারক আহমদ মারা গেছে,আমার প্রভুর কথা পূর্ণ হয়েছে। তিনি তো পূর্বেই বলে দিয়েছিলেন, এই পুত্র হয় দ্রুত মারা যাবে, নতুবা অনেক বড়ো খোদাপ্রেমী হবে। সুতরাং আল্লাহ্ তা'লা তাকে ডেকে নিয়েছেন। একজন মুবারক আহমদ কেন, যদি হাজার পুত্র হয় আর সবাই মারা যায় আর তাতে যদি আমার আল্লাহ্ সন্তুষ্ট হন, তাঁর বাণী পূর্ণতা পায়- তাতেই আমার আনন্দ।

এই অবস্থা দেখে আমরা সমবেদনা জ্ঞাপন করতে গিয়েও আমাদের মাঝে কারো সমবেদনা জ্ঞাপনের সাহস হয় নি।"

(সীরাতুল মাহদী, ২য় খণ্ড, রেওয়ায়েত নম্বর-১১৯১)

হযরত নওয়াব মুবারকা বেগম সাহেবা (রা.) লেখেন, "আল্লাহ্ তা'লার পবিত্র সত্তায় তাঁর সত্যিকারের ভালোবাসা সর্বদা দৃষ্টিগোচর হতো। আমি একবার তাকে দোয়া করতে ও কাঁদতে দেখি। খুব বেদনাভরা হৃদয়ে তিনি নিজ প্রিয় প্রভু ও প্রেমাস্পদকে ডাকছিলেন আর বার বার বলছিলেন, হে আমার প্রিয় প্রভু! হে আমার প্রিয় প্রভু! আমি এটি স্বয়ং দেখেছি।

তিনি (আ.) রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর প্রেমিক ছিলেন, সুমহান প্রভুর প্রেমিক ছিলেন। তাঁর চেহারায় সেই ভালোবাসার জ্যোতি ছিল, তাঁর মুখে সেই জ্যোতি বহমান ছিল , তাঁর কথায় সেই জ্যোতির ঝরনাধারা প্রবাহিত হতো। কিন্তু অন্ধরা তা দেখতে পায় নি।"(তাহরীরাত মুবারিকা, পৃ: ৩১২-৩১৩)

লুধিয়ানার প্রখ্যাত সুফি বুযুর্গ হযরত মু নশি আহমদ জান সাহেব যখন হজ্জে যাচ্ছিলেনতখন হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) হজ্জে যাবার পূর্বে তাকে একটি পত্র লেখেন। তাতে তিনি লেখেন,

"এই অযোগ্য-অধমের এক বিনীত নিবেদন স্মরণ রাখবেন। যখন আল্লাহ্র কৃপায় আপনার বাইতু ল্লাহ্ যিয়ারত করার সুযোগ হবে তখন সেই পবিত্র আশিসময় স্থানে আল্লাহ্রএই অধম বান্দার পক্ষ থেকে নিম্নোক্ত শব্দে একান্ত বিনয় ও দীনতার সাথে এবং বিগলিত চিত্তে নিবেদন করবেন,

'হে পরম করুণাময়! তোমার এক অসহায় ও অকর্মণ্য, পাপী ও অযোগ্য বান্দা গোলাম আহমদ, যে তোমার পৃথিবীর হিন্দুস্থানে অবস্থান করছে, তার পক্ষ থেকে এই নিবেদন- হে পরম করুণাময়! তুমি আমার প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে যাও এবং আমার সমস্ত ভুলত্রুটি ও পাপসমূহ ক্ষমা করো, কেননা তুমি অতীব ক্ষমাশীল ও বার বার কৃপাকারী। আর আমার দ্বারা সেই কাজ সম্পন্ন করাও যাতে তুমি খুবই সন্তুষ্ট হও। আমার ও আমার প্রবৃত্তির মধ্যে পূর্ব ও পশ্চিমের ন্যায় দূরত্ব সৃষ্টি করে দাও, আর আমার জীবন, আমার মৃত্যু ও আমার সমস্ত শক্তি যা আমাকে দান করা হয়েছে- সবই তোমার পথে নিয়োজিত করোএবং তোমারই ভালোবাসায় আমাকে জীবিত রাখো, তোমারই ভালোবাসায় আমাকে মৃত্যু দাও এবং তোমারই পরিপূর্ণ প্রেমিকরূপে পুনরুত্থিত করো। হে পরম করুণাময়! যে কর্ম সম্পাদনের জন্য তুমি আমাকে প্রত্যাদিষ্ট করেছ আর যে কর্মযজ্ঞের জন্য তুমি আমার অন্তরে উদ্দীপনা সৃষ্টি করেছ- তোমার অনুগ্রহে তা পরিপূর্ণ করে দাও এবং অধমের মাধ্যমে ইসলামবিদ্বেষীদের বিরুদ্ধে ও সেই সমস্ত লোকের বিরুদ্ধে যারা ইসলামের অনিন্দ্য সুন্দর শিক্ষা সম্পর্কে অজ্ঞ- ইসলামের সত্যতা প্রমাণ করাও। এই অধম, নিষ্ঠাবান অনুসারী এবং সমমনাদেরকে ক্ষমা এবং দয়ার নিরাপত্তায় রেখে ইহকাল ও পরকালে তাদের অভিভাবক হয়ে যাও আর সবাইকে তোমার সন্তুষ্টির নিবাসে পৌঁছাও এবং মহানবী (সা.)-এর পরিবার ও সাথিদের প্রতি অধিক পরিমাণে শান্তি ও কল্যাণ অবতীর্ণ করো।'

(সীরাত মসীহ মওউদ আলাইহিস সালাম, প্রণেতা- শেখ ইয়াকুব আলি সাহেব ইরফানি, পৃ: ৫৪১-৫৪২)

আমি এই সুদীর্ঘ দোয়ার কিছু অংশ পাঠ করেছি, সম্ভবত মাঝে আরো কিছু শব্দ বাদ পড়ে থাকবে। যাহোক, হযরত মুনশি সাহেব হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর নির্দেশনা অনুযায়ী তার দলের সাথে সেই বছর বড়ো হজ্জের সময় বায়তু ল্লাহ্ শরীফ ও আরাফাতের মাঠে এই দোয়া করেছেন।

আমরা লক্ষ্য করি, তাঁর (আ.) এই দোয়ার প্রতিটি শব্দঅসাধারণভাবে আল্লাহ্র ভালোবাসায় রঙিন ছিল। এক আল্লাহ্র প্রতি ভালোবাসার মহান বহিঃপ্রকাশ ঘটে এবং আল্লাহ্র প্রতি তাঁর ভালোবাসা প্রতিটি শব্দ থেকে উৎসারিত হতে দেখা যায়।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, আমি বলছি, আমাকে যদি এ বিষয়ে নিশ্চয়তা প্রদান করা হয় যে, আল্লাহ্কে ভালোবাসার কারণে এবং তাঁর আনুগত্যের কারণে কঠিন থেকেকঠিনতর শাস্তি দেওয়া হবে- তবুও আমি শপথ করে বলছি, আমার প্রকৃতিই এমন, তা এসব দুঃখকষ্ট ও বিপদকে আনন্দ ও ভালোবাসার উচ্ছ্বাস নিয়ে সাগ্রহে সহ্য করতে প্রস্তুত থাকবে। আর এমন নিশ্চিত শাস্তি ও কষ্ট সত্ত্বেও আল্লাহ্ তা'লার আনুগত্য ও অনুসরণ থেকে এক পাও সরে দাঁড়ানোকে হাজার নয়, বরং সীমাহীন মৃত্যুর চেয়েও ভয়ংকর ও বিপদাবলির সমষ্টি মনে করে।"(মালফুযাত, ২য় খণ্ড, পৃ: ৫১৭)

অতঃপর আরো বলেন, কত হতভাগা সে ব্যক্তি যে আজও জানে না- তার এরূপ এক খোদা আছেন যিনি সকল বিষয়ে সর্বশক্তিমান! আমাদের খোদাই আমাদের স্বর্গ। আমাদের খোদাতেই আমাদের আনন্দ। কেননা আমি তাঁকে দর্শন করেছি এবং তাঁকে সকল সৌন্দর্যের আধার হিসেবে পেয়েছি। প্রাণের বিনিময়ে হলেও এই সম্পদ হস্তগত করার যোগ্য। প্রাণের বিনিময়েও যদি এই মণি ক্রয় করতে হয় তবে তা করা উচিত। হে (খোদা লাভে) বঞ্চিত ব্যক্তিগণ! তোমরা এই প্রস্রবণের দিকে ধাবিত হও, এটি তোমাদের সিঞ্চিত করবে। এটি জীবনের উৎস, এটি তোমাদেরকে রক্ষা করবে। আমি কি করব এবং কী উপায়ে এই সুসংবাদ তোমাদের হৃদয়ঙ্গম করিয়ে দেবো? মানুষের শ্রুতিগোচর করার জন্য কোন জয়ঢাক দিয়ে আমি বাজারে-বন্দরে ঘোষণা করব, 'ইনি তোমাদের খোদা'। কোন ঔষধ আমিপ্রয়োগ করব যেন শ্রবণের জন্য তাদের কর্ণ উন্মুক্ত হয়?

যদি তোমরা খোদার হয়ে যাও তবে নিশ্চিত হতে পারো যে, খোদা তোমাদেরই। তোমরা নিদ্রাভিভূত থাকবে এবং খোদা তোমাদের জন্য জাগ্রত থাকবেন। তোমরা শত্রুর বিষয়ে সম্পূর্ণ অজ্ঞ থাকবে, কিন্তু খোদা তার ওপর দৃষ্টি রাখবেন এবং তার ষড়যন্ত্রকে ব্যর্থ করে দেবেন। তোমরা এখনো অবগত নও যে, তোমাদের খোদা কী কী শক্তির অধিকারী। যদি তোমরা অবগত হতে তবে দিনেকের তরেও এই সংসারের জন্য চিন্তিত হতে না। যে ব্যক্তির নিকট একটি ধনভাণ্ডার রয়েছে, সে কি কখনো একটি পয়সা নষ্ট হলে সেজন্য বিলাপ বা চিৎকার করে মরে? সুতরাং তোমরা যদি এই ধনভাণ্ডার সম্বন্ধে জ্ঞাত থাকতে যে, খোদা তোমাদের প্রত্যেক প্রয়োজনের সময় কাজে আসবেন, তবে সংসারের জন্য তোমরা এরূপ আত্মহারা হতে না। খোদা এক প্রিয় সম্পদ, তোমরা তাঁর সমাদর করো। প্রত্যেক পদে তিনিই তোমাদের সহায়ক। তাঁর সাহায্য ব্যতিরেকে তোমরা কিছুই নও এবং তোমাদের পার্থিব উপকরণ ও প্রচেষ্টা কিছুই নয়।" (কিশতিয়ে নূহ, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড-১৯, পৃ: ২১-২২)

এরপর আল্লাহ্ তা'লার প্রতি ভালোবাসার বহিঃপ্রকাশ করে অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক ভঙ্গিমায় তিনি (আ.) বলেন, হে আমার খোদা! আমার মওলা! আমার প্রিয় মালিক! আমার প্রিয়! আমার প্রেমাস্পদ! (এরপর তিনি নিজের সম্পর্কে বলেন,) জগৎ আমাকে বলে, তুই কাফির! কিন্তু তোমার চেয়ে প্রিয় অন্য কাউকে কি আমি পাব যার খাতিরে তোমাকে পরিত্যাগ করব? কিন্তু আমি দেখছি, মানুষ যখন ঔদাসীন্যের ঘোরে থাকে, যখন আমার বন্ধুবর্গ এবং শত্রুদেরও কোনো খবরই থাকে না যে, আমি কী অবস্থায় আছি- তখন তুমি আমাকে জাগ্রত করো আর আমাকে স্নেহ ও ভালোবাসার সাথে বলো যে, 'ব্যথিত হয়ো না, আমি তোমার সাথে আছি।' হে আমার প্রভু! এটি তাহলে কীভাবে সম্ভব, এই অনুগ্রহ থাকা সত্ত্বেও আমি তোমাকে পরিত্যাগ করব? কখনও নয়! কখনও নয়!"

(সীরাত হযরত বাণী সিলসিলা আহমদীয়া, মৌলানা শরীফ আহমদ আমীনি সাহেবের ভাষণ থেকে উদ্ধৃত)

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, আমি সেই নিদর্শনাবলি গণনা করতে পারব না যেগুলো সম্পর্কে আমি অবহিত। আমি তোমাকে জানি যে, তুমিই আমার খোদা। [তিনি (আ.) আল্লাহ্ তা'লাকে সম্বোধন করে এটিবলেন।] এজন্য আমার আত্মা তোমার নামে এমনভাবে উচ্ছ্বসিত হয় যেভাবে দুগ্ধপোষ্য শিশুনিজ মাকে দেখে উচ্ছ্বাস বোধ করে। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ আমাকে শনাক্ত করতে পারে নি এবং কবুল করে নি।"

(তিরইয়াকুল কুলুব, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড-১৫, পৃ: ৫১১)

অতএব, এ ছিল ঐশী প্রেম ও আল্লাহ্র প্রতি ভালোবাসা যা তাঁর মনিবের অনুসরণের ফলে হযরত আকদাস মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর মাঝে আল্লাহ্র জন্য সৃষ্টি হয়েছে। আর এ বিষয়ে তিনি (আ.) তাঁর জামা'তকেও সম্বোধন করে নসীহত করেছেন। তিনি (আ.) বলেন, সকল প্রকার ত্যাগ স্বীকারের জন্য প্রস্তুত থাক। যখন তোমরা আল্লাহ্ তা'লার উদ্দেশ্যে কুরবানী করবে, তাঁর প্রতি ভালোবাসা প্রকাশ করবে, তাঁর প্রাপ্য প্রদান করবে, তখন আল্লাহ্ তা'লাও তোমাদের সকল শত্রু থেকে তোমাদের রক্ষা করবেন, সকল দুঃখকষ্ট থেকে তোমাদের দূরে রাখবেন। আর তাঁর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে যে কাজই করবে, এর প্রতিদানে আল্লাহ্ তা'লা তোমাদের অগণিত দানে ভূষিত করবেন- ইহকালেও এবং পরকালেও। আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে তাঁর এরূপ প্রেমাস্পদ ও প্রেমিকে পরিণত করুন।

যেমনটি সবাই জানেন, গতকাল থেকে নতুন বছর শুরু হয়েছে। সবাই একে অপরকে নববর্ষের শুভেচ্ছাও জানাচ্ছে।

দোয়া করুন, এ বছরটি যেন আমাদের জন্য অগণিত কল্যাণবয়ে আনে। আল্লাহ্ তা'লা বিরোধীদের ও শত্রুদের সকল ষড়যন্ত্র ধূলিস্মাৎ করে দিন এবং জামা'তকে পূর্বের তুলনায় অধিক উন্নতি দান করুন। আমরা যারা বহির্বিশ্বে আছি, বিশেষ করে ধর্মীয়ভাবে স্বাধীন এসব দেশে স্বাধীনভাবে বসবাস করছি এবং নতুন বছরের আনন্দ উদযাপন করছি, এমনকি পাকিস্তান প্রভৃতি দেশেও মানুষ নববর্ষ উদযাপন করছে; এমন আনন্দের মুহূর্তে নিজেদের কারাবন্দি ভাইদেরও দোয়ায় স্মরণ রাখুন।

কিছুদিন আগে আমি মুবারক সানী সাহেবের কথা বলেছিলাম যাকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে, তিনি ছাড়াও অন্য অনেক আহমদী পাকিস্তানের বিভিন্ন

কারাগারে বন্দি অবস্থায় আছেন।এমতাবস্থায়ও তারা আল্লাহ্ তা'লার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে নতুন বছরে প্র বেশ করছেন।তাদের কোনো অভিযোগ-অনুযোগ নাই। আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টির খাতিরে তারা লোহার বেড়ি পরিধান করে আছেন। আল্লাহ্ তা'লা তাদের দ্রুত মুক্তির উপকরণ সৃষ্টি করুন। আমাদেরও আর সেই বন্দিদের এবং বিভিন্ন সমস্যায় জর্জরিত সকল আহমদীরও যেন আল্লাহ্ তা'লার ভালোবাসার চেতনা পূর্বের তুলনায় অধিক অর্জিত হয়, দুঃখকষ্ট ও সমস্যার কারণে আমাদের আল্লাহ্ তা'লার প্রতি ভালোবাসা হ্রাস পাবার পরিবর্তে যেন পূর্বের তুলনায় আরো বৃদ্ধি পায়। নির্যাতিতদের জন্যও দোয়া করুন, আল্লাহ্ তা'লা বিশ্বের সকল নির্যাতিত মানুষকে অত্যাচারীদের কবল থেকে রক্ষা করুন এবং পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হোক।

নামাযের পর আমি গায়েবানা জানাযাও পড়াবো। তিনজনের গায়েবানা জানাযা রয়েছে। প্রথম স্মৃতিচারণ রেহানা বাসমা সাহেবার যিনি সৈয়্যদ সাঈদ আহমদ নাসের সাহবের স্ত্রী ছিলেন। নব্বই (৯০) বছর বয়সে সম্প্র তি মৃত্যুবরণ করেছেন, ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। আল্লাহ্ তা'লার অনুগ্রহে তিনি ওসিয়্যত করেছিলেন। তিনি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর প্রপৌত্রী, হযরত মির্যা সুলতান আহমদ সাহেব (রা.)-র পৌত্রী, হযরত মির্যা আযীয আহমদ সাহেব (রা.)-র কন্যা এবং হযরত মীর ইসহাক সাহেব (রা.)-র দৌহিত্রী ছিলেন। বিয়ের পর তিনি স্বামীর সাথে পূর্ব আফ্রিকায় চলে যান এবং কেনিয়াতে অবস্থান করেন। সেখানেও তিনি লাজনার সেবা করেছেন, কাজ করেছেন এবং সংগঠনের বিভিন্ন পর্যায়ে সেবা প্রদান করেছেন। তার দুই পুত্র ওয়াকেফে যিন্দেগী। সৈয়্যদ তাহের আহমদ, এডিশনাল নাযের ইশায়াত আঞ্জুমানে আহমদীয়া রাবওয়া এবং সৈয়দ মুজাফ্ফর আহমদ সাহেব ওয়াকেফে যিন্দেগী হিসেবে জায়েদাদ বিভাগে সেবা করছেন। তার তিনজনপুত্র; আরেক পুত্র আনিস আহমদ। তার কন্যা সুলতানা সাহেবা ডাক্তার মির্যা সুলতান আহমদ সাহেবের স্ত্রী, আর ফারহানা হলেন মির্যা কালীম আহমদ সাহেবের স্ত্রী, সাহেবযাদা মির্যা ওয়াসীম আহমদ সাহেবের পুত্রবধূ।

তার পুত্র সৈয়্যদ তাহের আহমদ সাহেব বর্ণনা করেন, পবিত্র কুরআনের প্রতি সুগভীর ভালোবাসা ও আন্তরিকতা ছিল আর অনেক বেশি ও নিয়মিত তিলাওয়াত করতেন। খিলাফতের প্রতি অসীম ভালোবাসা ও বিশ্বস্ততার সম্পর্ক ছিল। এ বিষয়টি তার সকল সন্তানই লিখেছেন। এ বিষয়টিই তিনি তার সন্তানদের মাঝে তৈরি করেছেন।

তার পুত্র আনিস আহমদ লিখেছেন, আবশ্যিকভাবে প্রত্যেকের সুখ-দুঃখে অংশীদার হতেন। আর আমাদেরকে বিশেষভাবে চাঁদা প্রদানের নির্দেশ দিতেন এবং চাঁদা আদায় করেছি কি না জিজ্ঞেস করতেন। অনুরূপভাবে নফল রোযার প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করতেন। তার কন্যা ফারহানা ফওজিয়া বলেন, আমি শৈশব থেকেই আম্মাকে নিয়মিত তাহাজ্জুদ আদায় করতে দেখেছি। নামাযের প্রতি নিজেও যত্নবান ছিলেন এবং সময়মতো আদায়ের প্রতি সন্তানদেরকেও উৎসাহিত করতেন। তিনি বলেন, (অনেক বেশি) পবিত্র কুরআন তিলাওয়াত করার কারণে আমার আম্মার বড়ো বড়ো সূরা মুখস্থ হয়ে গিয়েছিল। আর আমাদেরকে অনেক উচ্চৈঃস্বরে পবিত্র কুরআন তিলাওয়াত করতে বলতেন এবং পবিত্র কুরআন বার বার পাঠ করার কারণে, এটি গভীরভাবে অধ্যয়নের কারণে তার মাঝে এই বৈশিষ্ট্য বিকশিত হয়েছিল যে, আমরা দূরে বসে তিলাওয়াত করতে গিয়েও যদি কোনো ভুল করতাম আর তিনি তিলাওয়াত শুনতে পেতেন, তবে ভুল শুধরে দিতেন। অনুরূপভাবে অনেক বেশি অতিথিপরায়ণ ছিলেন। বর্তমানে অনেক সুযোগ-সুবিধা রয়েছে, কিন্তু আগে এমনসুযোগ-সুবিধা ছিল না; শীতকালে গিজার বা বয়লারের মাধ্যমে গরম পানি পাওয়া যেত না।তাই নিজেকেই সকালে উঠে পানি গরম করতে হতো, কিন্তু তবুও অতিথিদের ওযু করার জন্য গরম পানি সরবরাহ করতেন।

হযরত ডাক্তার মীর ইসমাঈল সাহেব (রা.)-র পুত্র সৈয়দ সাঈদ আহমদ সাহেব মরহুমার স্বামী ছিলেন। তিনি হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আর-রাবে (রাহে.)-র বন্ধু ছিলেন। কখনো সফরে গেলে তাদের বাড়িতে অবস্থান করতেন। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আর-রাবে (রাহে.) স্বয়ং উল্লেখ করেন, (মরহুমা) একদম ভোরে উঠে আমার ওযুর জন্য গোসলখানায় গরম পানি রেখে দিতেন। একদিন আমি সিদ্ধান্ত নিলাম,আমি তাড়াতাড়ি উঠে নিজেই পানি গরম করব যেন তার কষ্ট না হয়। তিনি (রাহে.) বলেন, আমি যথাসম্ভব তাড়াতাড়ি উঠি, কিন্তু আমি দেখলাম, এর আগেই সেখানে গরম পানি রাখা ছিল। তিনি অনেক আর্থি ক সমস্যার সম্মুখীন হলেও অত্যন্ত দক্ষতার সাথে তার পরিবারকে সামলেছেন।

যেভাবে আমি বলেছি, প্র থমে কেনিয়াতে ছিলেন, তারপর হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আস-সালেস (রাহে.)-র নির্দেশে তারা পাকিস্তানে ফিরে আসেন। এখানে এসে (আর্থি ক) অবস্থা আগের মতো ছিল না, কিন্তু তিনি অত্যন্ত হাসিমুখে এবং ধৈর্যের সাথে সবকিছু সহ্য করেছেন।

তার বোন আতিকা ফারজানা বলেন, জামা'তের জন্য তার আত্মমর্যাদাবোধ ছিল প্রবল। জামাতের বিরুদ্ধে কোনো কথা শোনা তিনি পছন্দ করতেন না। একইভাবে তার বড়ো বোন দুররে শাহবার দোরদানা বলেন, অ্যালার্ম ছাড়াই তাহাজ্জুদে উঠে যাওয়া তার অভ্যাস ছিল। তিনি বলেন, আমি আমার পাঁচ মেয়ের কারণে দুশ্চিন্তা করতাম; তিনি আমাকে বলতেন,কোনো চিন্তা কোরো না। আল্লাহ্ তা'লা তাদের উত্তম স্থানে বিয়ের ব্যবস্থা করবেন আর আল্লাহ্ তা'লা সে অনুযায়ী উত্তম স্থানে বিয়ের ব্যবস্থাও করে দিয়েছিলেন। তিনি বলেন, মরহুমা অত্যন্ত ধৈর্য শীলা, কৃতজ্ঞ ও সাহসী মহিলা ছিলেন। আল্লাহ্ তা'লা তার প্রতি ক্ষমা ও অনুগ্রহের আচরণ করুন।

পরবর্তী স্মৃতিচারণ হলো লাইবেরিয়ার লাজনা ইমাইল্লাহ্র প্রাক্তন ন্যাশনাল সদর মোকাররমা ইফ্ফাত হালীম সাহেবার। তিনি লাইবেরিয়ার মনরোভিয়া ক্লিনিকের ইনচার্জ ও ওয়াকেফে যিন্দেগী ডাক্তার আব্দুল হালীম সাহেবের সহধর্মিণী ছিলেন। তিনি অসুস্থ হয়ে চিকিৎসা করানোর জন্য হল্যান্ডে এসেছিলেন। গত ২১ ডিসেম্বর ৫৯ বছর বয়সে তিনি পরলোক গমন করেন, ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। আল্লাহ্ তা'লার অনুগ্রহে তিনি এক-তৃতীয়াংশের ওসিয়্যত করেছিলেন। তার বংশে আহমদীয়াতে সূচনা হয়ে তার পিতামহ মোকাররম মুহাম্মদ আলী সাহেবের মাধ্যমে, যিনি হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আসসানী (রা.)-র হাতে বয়আত করেছিলেন। ২০০৪ সনের জুলাই মাসে তিনি তার স্বামীর সাথে লাইবেরিয়াতে যান। ২১ বছর তিনি লাইবেরিয়াতে কাটিয়েছেন আর সেসময় তিনি দুই-তিন বার লাজনার সদর হিসেবেও সেবা করার সুযোগ পেয়েছেন। আর মৃত্যুকালেও তিনি সদর লাজনা হিসেবে সেবা করার সৌভাগ্য লাভ করছিলেন। নিয়মিত তাহাজ্জুদ নামায পড়তেন, রোযার বিষয়ে বিশেষভাবে সচেতন থাকতেন, নিয়মিত তিলাওয়াত করতেন, খিলাফতেরসাথে সুগভীর সম্পর্ক ও ভালোবাসার বহিঃপ্রকাশ ঘটাতেন আর নিজ সাংগঠনিক দায়িত্ব অত্যন্ত নিষ্ঠার সাথে পালন করতেন। আর্থিক কুরবানীর আহ্বানে স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করতেন। অনেক বেশি সদকা ও দান করতেন। অতিথিপরায়ণ ও মিশুক ছিলেন, হাস্যবদনে থাকতেন আর হতদরিদ্র মানুষদের সেবা করার স্পৃহা তার মাঝে পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান ছিল। অত্যন্ত পুণ্যবতী একজন নারী ছিলেন। তিনি কেবল নিজেই সাগ্রহে কুরআন তিলাওয়াত করতেন না, বরং লাজনা সদস্যাদের জন্য বিশেষ কুরআন ক্লাসের আয়োজন করাতেন।ছোটোদেরকে কুরআন পড়াতেন, এরপর তাদের আমীন অনুষ্ঠানও করাতেন। তার মাঝে অতিথিপরায়ণতার মহৎ গুণ ছিল। কেবল কয়েকদিন অতিথি আপ্যায়ন করতেন না, বরং দিনের পর দিন তার বাড়িতে অতিথিরা এসে অবস্থান করতেন আর তিনি সানন্দে অতিথি আপ্যায়ন করতেন। এমনকি রমযান মাসে তো তিনি নিয়মিত অভাবীদের জন্য সাহরী ও ইফতারীর ব্যবস্থা করতেন। প্রত্যেকে, যে-ই তাকে চিনত, তার এই মহৎ গুণের কথা অত্যন্ত ভালোবাসার সাথে স্মরণ করত।

একটি হালকার প্রেসিডেন্ট আরিফা সাহেবা বলেন, নিয়মিত নামাযের বিষয়ে সচেতন তো ছিলেনই; মাঝে মাঝে তার বাড়িতে আসা-যাওয়া হতো। মরহুমা নামাযের বিষয়ে এতটাসচেতন ছিলেন যে, কোনো কাজের মাঝখানে যখন নামাযের সময় হতো তখন বলতেন ,আগে নামায পড়ে নিই, এরপর বাকি কাজ করব। এটি বলতেন না যে, আগে কাজ শেষ করে নিই, এরপর নামায পড়ে নেব। আগে নামায পড়ার কথা বলতেন, পরে অবশিষ্ট কাজ করা যাবে।

একইভাবে লাইবেরিয়ার মুবাল্লিগ ফার্রুখ শাব্বির সাহেব লেখেন, ইফ্ফাত হালীম সাহেবার চরিত্রকে যদি কয়েক শব্দে বর্ণনা করতে হয় তবে 'তিনি আহমদীয়াতের প্রকৃত প্রতিচ্ছবি ছিলেন' বলাটাই যথেষ্ট হবে।

একইভাবে লাইবেরিয়ার একজন স্থানীয় ব্যক্তি মোমো কারোমা সাহেব, যিনি বর্তমানে মুবাল্লিগ হিসেবে কর্মরত, তিনি বলেন, আমার বেশ কয়েকবার মরহুমার সাথে সাক্ষাৎ করার ও তার সাথে কথা বলার সুযোগ হয়েছিল, আর প্রত্যেকবার আমার মনে হতো, আমি এমন এক মায়ের সাথে কথা বলছি, যার নিজ সন্তানের জন্য ভালোবাসার কোনো ঘাটতি নেই।

তার নিজের কোনো সন্তান ছিল না। শোকসন্তপ্ত পরিবারে স্বামী রয়েছেন। এছাড়া তিনি দুটি সন্তান দত্তক নিয়েছিলেন। একজন তার দেবরের মেয়ে, যাকে তিনি লালনপালন করেছেন এবং সেই মেয়েটি এখন চৌদ্দ বছরের এবং পড়াশোনা করছে। অপরজন হলো একজন লাইবেরিয়ান ছেলে, আহমদ মাসরূর সাংবা। তাকেও তিনি শৈশবেই দত্তক নেন এবং নিজের সন্তানের মতো বড়ো করেন। সে বর্তমানে ঘানার জামেয়া আহমদীয়া ইন্টারন্যাশনালে ষষ্ঠ বর্ষের (দারজায়ে খামেসার) ছাত্র। আল্লাহ্ তা'লা এই সন্তানদের জন্য তার দোয়া কবুল করুন এবং তার সাথে ক্ষমা ও অনুগ্রহপূর্ণ আচরণ করুন।

তৃতীয় স্মৃতিচারণ হলো মিশরের মুকাররম আব্দুল আলীম আল-বারবারী সাহেবের। তিনিও সম্প্রতি ৬৪ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেছেন। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। মরহুম অত্যন্ত পুণ্যবান, নিষ্ঠাবান এবং নিবেদিতপ্রাণ আহমদী ছিলেন। তার স্ত্রী ও কন্যা আল্লাহ্র ফযলে আহমদী। স্ত্রী লিখেছেন, আল্লাহ্ তা'লার প্রতি আমার স্বামীর এমন গভীর ভালোবাসা ছিল যে, মনে হতো- তিনি যেন আল্লাহ্র যিকর করার জন্যই জন্মগ্রহণ করেছেন। তিনি অত্যন্ত উন্নত চরিত্রের মানুষ ছিলেন, কখনো কারো সম্পর্কে কটু কথা বলেন নি। তিনি বলেন, আমাদের ৩১ বছরের দাম্পত্য জীবনে তিনি আমাকে কখনো কোনো কষ্ট দেন নি, বরং তিনি ছিলেন একজন অতি উত্তম ও পুণ্যবান স্বামী।

EDITOR
Tahir Ahmad Munir
Sub-editor: Mirza Safiul Alam
Mobile: +91 9 679 481 821
e-mail : Banglabadar@hotmail.com
website:www.akhbarbadrqadian.in
www.alislam.org/badr

REGISTERED WITH THE REGISTRAR OF NEWSPAPERS OF INDIA AT NO PUNBEN/ 2016 / 70524

সাপ্তাহিক **বদর** কাদিয়ান Weekly **BADAR** Qadian

Distt. Gurdaspur (Pb.) INDIA Qadian - 143516

POSTAL REG NO GDP- 43 / 2026 -2028 Vol-11 Thursday, 5-12-Feb, 2026 Issue No.6-7

Act.
MANAGER
ATHAR AHMAD SHAMIM
Mob: +91 9815639670
e.mail:managerbadrqnd@gmail.com

ANNUAL SUBSCRIPTION : Rs. 600/- (Per Issue : Rs. 12/-) (WEIGHT: 20-50 gms/issue)

তার মেয়ে ২০০৮ সালে এমটিএ আল-আরাবিয়া দেখার পর বয়আত করেছিল। তার মেয়ে শুধু নয়, বরং আব্দুল আলীম সাহেব নিজে ও তার মেয়ে উভয়েই ২০০৮ সালে এমটিএ দেখে বয়আত করেছিলেন। স্ত্রী লেখেন, আমি শুরুতে প্রবল বিরোধিতা করেছি এবং অনেক সমস্যা সৃষ্টি করেছি। এমনকি আমার পরিবারের সদস্যদের ডেকে এনেও বিরোধিতা করিয়েছি, কিন্তু বাবা ও মেয়ে দুইজনেই ধৈর্য ধরেছেন। একদিন তিনি নামাযের পর উচ্চৈঃস্বরে দোয়া করছিলেন। স্বামীর সম্বন্ধে তিনি বলছেন যে, আমার স্বামী দোয়া করছিলেন;আমি শুনেছি, আমার বিষয়ে তিনি দোয়া করছিলেন– হে আমার প্রভু! হয় তুমি আমার স্ত্রীকে হিদায়াত দাও, না হয় তাকে আমার থেকে দূরে নিয়ে যাও। তার স্ত্রী বলেন, এই দোয়াটি আমার মনে গভীর রেখাপাত করে, কিন্তু আমি তখন তাকে জানাই নি এবং নিজেও দোয়া করতে থাকি। অবশেষে এক মাস পর আল্লাহ্‌র অনুগ্রহে আমার অন্তর প্রশান্তি লাভ করে এবং বয়আত করার সৌভাগ্য অর্জন করি। যারা বলে থাকেন যে, আমরা পথনির্দেশ পাই না–তারা জেনে রাখুন! যারা পুণ্যসংকল্প নিয়ে পথনির্দেশ লাভ করতে চায়, আল্লাহ্ তা'লা অবশ্যই তাদেরকে পথ দেখিয়ে থাকেন।বয়আত গ্রহণের পর তার ভাইয়েরা চরম বিরোধিতা শুরু করে, কিন্তু তিনি ঈমানের ওপর অটল থাকেন। তার ভাইয়েরা একজন বিখ্যাত মৌলভীকে ডেকে আনে, যেন তাকে আহমদীয়াত থেকে বিচ্যুত করা যায়।কিন্তু সেই মৌলভী ব্যর্থ হয়। তার স্ত্রী লেখেন, কারণআমার স্বামী তাকে নিজের পক্ষ থেকে একটিই উত্তর দেন যে, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সত্যতা আমার কাছে এতটাই স্পষ্ট এবং আমার হৃদয়ে গভীরভাবে প্রোথিত যে, আমি আমার ঈমান থেকে বিচ্যুত হতে পারি না, কারণ হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর মাধ্যমেই আমি আল্লাহ্ তা'লার প্রকৃত মা'রেফত লাভ করেছি, যা আমি কোনোভাবেই পরিত্যাগ করতে পারি না। দেখুন, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) মানুষের হৃদয়ে আল্লাহ্‌র প্রতি কেমন ভালোবাসা সৃষ্টি করেছেন!

ইবাদতের ক্ষেত্রেও তিনি কঠোর পরিশ্রমী ছিলেন। তার স্ত্রী বলেন, তিনি ১১ বছর অসুস্থতার কষ্ট সহ্য করেছেন, কিন্তু সর্বদা ধৈর্যশীল ও আল্লাহ্‌র ইচ্ছাতেই সন্তুষ্ট ছিলেন। তিনি সর্বদা বলতেন, 'যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র সাথে সাক্ষাৎ করা পছন্দ করে, আল্লাহ্ তা'লাও তার সাথে সাক্ষাৎ করা পছন্দ করেন।' এমনকি মৃত্যুর শেষ দিনগুলোতেও তার মুখ থেকে 'আল্লাহ্', 'আল্লাহ্ ' শব্দ উচ্চারিত হতো।

মিশর জামা'তের প্রেসিডেন্ট সাহেব বলেন, আমি তার মাঝে জামা'ত ও খিলাফতের প্রতি সর্বদা এক অকৃত্রিম ভালোবাসা দেখেছি। কিছু মানুষ তাকে ফিতনায় ফেলার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু তিনি বয়আতের অঙ্গীকারে দৃঢ়তা ও বিশ্বস্ততার সাথে অবিচল ছিলেন। গ্রামের শত শত অআহমদীও আহমদীদের সাথে তার জানাযায় শরিক হয়েছে। তার ছেলে অআহমদী, কিন্তু তিনি তাকে এই ওসিয়্যত করে গিয়েছিলেন, আহমদীরাই আমার জানাযা পড়াবে। সে মোতাবেক প্রেসিডেন্ট সাহেব অআহমদীদের মসজিদে গিয়ে তার জানাযা পড়িয়েছেন এবং অআহমদীরাও তাতে শরিক হয়েছে। যেমনটি আমি বলেছি, ছেলে এখনো আহমদী হয় নি, কিন্তু সে অত্যন্ত উন্নত চরিত্রের অধিকারী এবং জামা'ত সম্পর্কে গবেষণা করছে। আল্লাহ্ তা'লা মরহুমের সাথে ক্ষমা ও অনুগ্রহের আচরণ করুন।

তাহের নাদীম সাহেবও তার সম্পর্কে লিখেছেন। তিনি বলেন, কয়েক বছর আগে আমি যখন মিশর যাই, তখন তার সাথে আমার দেখা হয়েছিল। তিনি বলেন, সেখানে আব্দুল আলীম সাহেব তার স্ত্রীর বয়আতের ঘটনাটি আমাকে শুনিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর ওপর আমার ঈমান তো শুরু থেকেই দৃঢ় ছিল, কিন্তু আল্লাহ্ তা'লা আমার দোয়া কবুল করে আমার স্ত্রীর বয়আতের মাধ্যমে আমার ঈমানকে আরো মজবুত করে দিয়েছেন। কারণ কেউ কল্পনাও করতে পারত না যে, একসময় যে স্ত্রী চরম বিরোধী ছিল, সে এখন আমার সাথে প্রতিটি জামা'তী অনুষ্ঠানে যায় এবং অত্যন্ত আনন্দের সাথে জামা'তের কাজ করে; পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, রান্নাবান্না থেকে শুরু করে সব কাজ যা লাজনা সদস্যারা করে থাকে– সেগুলোতে অংশ নেয়।

আল্লাহ্ তা'লা তার সন্তানদেরকেও, কন্যাকে এবং স্ত্রীকেও নিষ্ঠা ও বিশ্বস্ততায় উত্তরোত্তর বৃদ্ধি করুন, তার ছেলেকেও আহমদী হওয়ার তৌফিক দান করুন আর তার সাথে ক্ষমা ও অনুগ্রহসুলভ আচরণ করুন। (আমীন)

(আমীন) (আল ফজল ইন্টারন্যাশনাল,৯ জানুয়ারী, ২০২৬)

❁****❁****❁****❁

আহমদিয়্যাতের প্রতি বিদ্বেষ পোষণকারীরাও তাঁর আকর্ষণীয় ভাষণ শুনে ভালোবাসার সাগরে ডুব দিতে বাধ্য হতেন।

সম্মানিত মাওলানা আবদুল বাসিত শাহিদ সাহেব বর্ণনা করেন-

"একজন অ-আহমদী বুদ্ধিজীবী কাদিয়ানে গিয়ে হযরত মসলেহ মওউদ (রযিয়াল্লাহু আনহু)-এর ভাষণ শোনার পর লেখেন-'সমগ্র ভিড়টি এই পবিত্র আত্মার একটি ছোট আঙুলের ইশারায় চলছে। সবাই সম্পূর্ণ আনুগত্যে নতশির এবং নিজেদের ইমামের ভালোবাসায় রঞ্জিত বলে মনে হচ্ছে। এই ব্যক্তি কলমেরও অধিপতি, বক্তৃতায় উচ্চস্তরের বিশেষজ্ঞ এবং সংগঠনেরও উচ্চমানের শাসক।' (দৈনিক আল-ফজল, রাবওয়া, ১৭ ফেব্রুয়ারি ২০১১)

হযরত মসলেহ মওউদ (রযিয়াল্লাহু আনহু)-এর বরকতময় অস্তিত্ব কেবল একটি ভবিষ্যদ্বাণীর পরিপূর্ণতা ছিল না; বরং এটি ছিল এই ঘোষণা যে আল্লাহ আজও তাঁর বান্দাদের সঙ্গে কথা বলেন এবং তাঁর দ্বীনের সংরক্ষণের জন্য এমন ব্যক্তিত্ব সৃষ্টি করেন যারা "বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ জ্ঞানে পরিপূর্ণ।" এই রহমতের নিদর্শন চিরকাল সেইসব তৃষ্ণার্ত আত্মার জন্য প্রশান্তির উৎস হয়ে থাকবে, যারা আল্লাহর সত্তা ও সত্য দ্বীনের সন্ধানে উদ্?ভ্রান্ত।

হযরত মসলেহ মওউদ (রযিয়াল্লাহু আনহু) বলেছিলেন-

এক সময় আসবে, যখন সবাই বলবে-

উম্মাহর এই খাদেমের ওপর আল্লাহ রহমত বর্ষণ করুন।

এই মহান ভবিষ্যদ্বাণীর ঈমানউদ্দীপক পূর্ণতা এবং এর চলমান বৈশ্বিক প্রভাব স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করার পর আজ আলহামদুলিল্লাহ আমরা পূর্ণ দৃঢ়তার সঙ্গে বলতে পারি-হযরত মসলেহ মওউদ (রযিয়াল্লাহু আনহু)-এর বরকতময় সত্তা কেবল একজন ব্যক্তির নাম নয়; বরং তিনি ছিলেন এক আল্লাহর সেই পরিপূর্ণ ক্ষমতার প্রকাশ, যিনি ইসলামের নবজাগরণের জন্য ঐশী সহায়তার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। তাঁর বরকতময় অস্তিত্ব পৃথিবীর প্রান্তসীমা পর্যন্ত তাওহিদের পতাকা উত্তোলন করে প্রমাণ করে দিয়েছে যে মুহাম্মদী মসীহের এই সাহসী সেনাপতি সত্যিই সেই "বরকতময় পুত্রচ-যিনি তাঁর প্রভুর সঙ্গে ভালোবাসার বন্ধন এমনভাবে রক্ষা করেছেন যে আসমান ও জমিনের সাক্ষ্য তাঁর পক্ষেই ধ্বনিত হয়েছে-

এখন সময় এসেছে যে সত্যচিন্তকেরা বলে-

উম্মাহর এই খাদেমের ওপর আল্লাহ রহমত বর্ষণ করুন।

হে ফজলে উমর, তোমার মহৎ গুণাবলি-

আমার চিন্তা ও ভাষা সেগুলো পূর্ণরূপে বর্ণনা করতে অক্ষম।

যুগ খলীফার বাণী

"সব সময় মনে রেখ- ধর্মীয় জ্ঞান অর্জনের মূল ও শ্রেষ্ঠ উপায় হল পবিত্র কুরআনের অধ্যয়ন। আমাদের শরীর টিকে থাকার জন্য যেমন খাদ্য ও পানির প্রয়োজন হয়, তেমনই আত্মিক জীবনের পুষ্টির জন্য আল্লাহ তা'লা তাঁর প্রেরিত নবী হযরতমুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর মাধ্যমে আমাদের দান করেছেন এক চিরন্তন আত্মিক আহার- 'পবিত্র কুরআন'।

... অতএব অশালীন চলচ্চিত্র বা অনুষ্ঠান দেখে কিংবা ইন্টারনেট ও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে অমূল্য সময় অপচয় না করে দৃঢ় প্রতিজ্ঞা কর- তোমরা পবিত্র কুরআন ও এর শিক্ষার জ্ঞান অর্জনে নিজেকে নিয়োজিত করবে। কুরআনকে তোমাদের আত্মশুদ্ধি, চরিত্রগঠন ও আল্লাহ তা'লার নৈকট্য লাভের মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করবে। এ কুরআনই তোমাদেরকে সমাজে কল্যাণকর ও ইতিবাচক ভূমিকা পালনের পথে পরিচালিত করবে। তাই কুরআনের প্রতিটি আয়াত গভীর মনোযোগসহকারে পাঠ কর, হৃদয়ে ধারণ কর এবং ভালবাসা ও শ্রদ্ধার সঙ্গে মূল্য দাও।"

(ন্যাশনাল ইজতেমা, মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া, ইউকে, ২১ সেপ্টেম্বর ২০২৫)

মহান আল্লাহ্‌র বাণী

এবং যখন ভাগ-বন্টনের সময় নিকটাত্মীয়, এতীম এবং মিসকীনগণ উপস্থিত হয়, তখন তাহাদিগকেও উহা হইতে দিও এবং তাহাদের সহিত ন্যায়-সঙ্গত কথা বলিও। (আন-নিসা: ৯)

দোয়াপ্রার্থী: Late-Azima Khatun,
From: Mirza Enayetulla Sb, Harhari, Murshidabad

Printed & Published by: Jameel Ahmed Nasir on behalf of Nigran Board of Badar. Name of Owner: Nigran Board of Badar. And printed at Fazle-Umar Printing Press. Harchowal Road, Qadian, Distt. Gurdaspur-143516, Punjab. And published at office of Weekly Badar Mohallah - Ahmadiyya, Qadian Distt. Gsp-143516, Punjab. India. Editor: Tahir Ahmad Munir